بِسْمِ ٱللَّٰهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Alim Batch-201

Subject:RAM302

“ইসলামের দৃষ্টিতে সন্তান-সন্তুতি লালন পালন করার গুরুত্ব ও ফজিলত”

Submitted By

Afifa Musarrat Bushra

Roll:20102125

6th Semester

Address:Gandaria,Dhaka

Contact:01929718347

Submitted To

Honorable Ustaz Abdul Wahid

Islamic Online Madrasah

اِنَّ الْحَمدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَ مَنْ يُّضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَهُ وَ أَشْهَدُ
أَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُه

সন্তান জীবনের শোভন ও সৌন্দর্য। সুসন্তান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ। সন্তানের চোখে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেন মা-বাবা। আদর্শ সন্তানের মাধ্যমে দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মান বৃদ্ধি হয় তাঁদের।মৃত্যুর পরও তার সুফল পেতে থাকেন অনন্তকাল।পবিত্র কোরআনে সন্তানকে আল্লাহ তাআলা জীবনের সৌন্দর্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে, ‘সম্পদ ও সন্তান পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য।’(সুরা : কাহাফ, আয়াত : ৪৬)

সূচীপত্র

ভূমিকা	৪-৮
সন্তান প্রতিপালনে ইসলামের প্রেরণা	৯-১৬
মা-বাবার কর্তব্য	১৭-২৭
সন্তান লালন-পালন	২৮-৩২
সন্তান গঠনে মায়ের ভূমিকা	
১	৩৩-৩৫
২	৩৬-৩৯
সন্তানকে তাওহীদের শিক্ষা দান	৪০-৪২
ইলম অর্জনে শিশু	৪৩-৪৫
সন্তানকে সালাতের নির্দেশ দান	৪৫-৫০
সন্তানের ক্যারীয়ার গঠনে পিতা-মাতার কর্তব্য	৫০-৫৩
শাস্তি প্রদান : শরয়ি দৃষ্টিকোণ	৫৩-৬৬
সন্তানকে অভিশাপ না দেয়া	৬৭-৬৯
শিশুদের প্রতি রাসূল “ﷺ” এর ভালোবাসা	৬৯-৭৫
একজন সফল গার্ডিয়ানের গুণাবলি	৭৫-৮১
তথ্যসূত্র	৮২

মাতা-পিতার হাত ধরেই সন্তান প্রবেশ করে কোলাহলময় পৃথিবীতে, গাত্রে লাগায় ইহজাগতিক আলো-বাতাস। মাতা-পিতার কাছ থেকেই শেখে প্রথম শব্দমালা। তাই মাতা-পিতার স্কন্ধেই অর্পিত সন্তানকে যথার্থরূপে মর্দে মুমিন তথা মানুষের মতো মানুষ করে গড়ে তোলার দায়িত্ব। বর্তমান প্রবন্ধে এ বিষয়টি নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে।

সন্তান লালন: মাতা-পিতার এক মহান দায়িত্ব

জীবনের শুরুতেই সন্তান যাদের হাতের স্পর্শ পায়, যাদেরকে সামনে দেখে, যাদের গন্ধ শুঁকে, তারা হলেন মাতা-পিতা। মাতা-পিতার হাত ধরেই সন্তান প্রবেশ করে কোলাহলময় পৃথিবীতে, গাত্রে লাগায় ইহজাগতিক আলো-বাতাস। মাতা-পিতার কাছ থেকেই শেখে প্রথম শব্দমালা। তাই মাতা-পিতার স্কন্ধেই অর্পিত সন্তানকে যথার্থরূপে মর্দে মুমিন তথা মানুষের মতো মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার দায়িত্ব।

ইমাম গাযালি রহ. বলেছেন: সন্তান মাতা-পিতার কাছে আমানত। সন্তানের হৃদয় নকশা-ইমেজমুক্ত এক সরল-স্বচ্ছ মুক্তা, যা যেকোনো নকশা-ইমেজ ধারণ করতে প্রস্তুত। তাকে যে দিকেই হেলানো হবে সে সে দিকেই ঝুঁকে পড়বে। যা কিছু উত্তম ও ভালো তা যদি তাকে শেখানো হয়, তাকে যদি এগুলোর প্রতি অভ্যস্ত করে নেয়া হয় তবে সেভাবেই সে বড় হবে। ফলে তার মাতা-পিতা দুনিয়া ও আখেরাতে সৌভাগ্যবান হবে। তার উস্তাদ ও আদব-কায়দার শিক্ষকগণও তৃপ্তি অনুভব করবে। এর বিপরীতে তাকে যদি খারাপ বিষয়ে অভ্যস্ত করা হয়, জন্তু জানোয়ারের মতো তাকে লাগামহীন করে দেওয়া হয়, তাহলে সে ভাগ্যবিড়ম্বিত হবে, অতঃপর নিক্ষিপ্ত হবে ধ্বংসের গহ্বরে। আর এর দায়ভার বর্তাবে তাদের ঘারে যারা ছিল তার কর্ণধার, যাদের দায়িত্ব ছিল তাকে মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: প্রতিটি শিশু ফিতরতের ওপর জন্মগ্রহণ করে, আর তার মাতা-পিতা তাকে ইয়াহূদী, মাজুসী (অগ্নিপূজক) অথবা খ্রিষ্টান বানায়।

সে হিসেবে সন্তান লালনে মাতা-পিতাকে হতে হবে যথেষ্ট সচেতন, ঐকান্তিক ও পরিশ্রমী। সন্তানের শারীরিক সুস্থতার প্রতি মাতা-পিতা নিঃসন্দেহে যথেষ্ট যত্নবান থাকেন। তবে এর পাশাপাশি, ধার্মিকতা, উন্নত চরিত্র, আল্লাহ-ভীরু হৃদয় ইত্যাদি পরিগঠনের ব্যাপারেও সন্তানের প্রতি যত্ন নিতে হয় সমধিক গুরুত্ব দিয়ে। কেননা সন্তান মাতা-পিতার কাছে গচ্ছিত এক আমানত। তাই সন্তানের শারীরিক পরিপুষ্টির পাশাপাশি হৃদয়ের পুষ্টি সরবরাহের প্রতি নজর না দিলে তা হবে আমানতের খিয়ানত ও সন্তানের প্রতি অন্যায়-অবিচার। সন্তানের হৃদয়কে পুষ্ট করার অর্থ ধর্মীয় ও মানবিক গুণাবলিতে ঋদ্ধ করে তোলা, আল্লাহর প্রতি গভীর বিশ্বাস, আখেরাতের প্রতি দৃঢ় ইমান ও ইসলামের অন্যান্য মৌলিক আকীদার প্রতি দৃঢ়চিত্ত করে বড় করা। এর অন্যথা হলে মাতা-পিতাকে আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে নিশ্চিত রূপেই। হাদিসে পুরুষকে তার পরিবার পরিজনের দায়িত্বশীল, নারীকে তার স্বামীর বাড়িতে দায়িত্বশীল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং প্রত্যেককে যার যার দায়িত্বশীলতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হতে হবে বলে ঘোষণা এসেছে।

একটি বিশুদ্ধ বর্ণনা মতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله، ومسؤول عن رعيته ، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة
عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده، ومسؤول عن رعيته ، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته».

"তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার দায়িত্বকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হতে হবে। পুরুষ তার পরিবারে দায়িত্বশীল এবং সে তার দায়িত্বকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। নারী তার স্বামীর ঘরে দায়িত্বশীল এবং তাকে তার দায়িত্বকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হতে হবে। সেবক তার মনিবের সম্পদে দায়িত্বশীল এবং তাকে তার দায়িত্বকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হতে হবে। তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার দায়িত্বকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হতে হবে"

সন্তান লালন একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এ দায়িত্ব অন্যের কাঁধে চাপিয়ে মাতা-পিতা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেললে তা হবে দিবাস্বপ্ন দেখার মতো এক ঘটনা। যারা ভুক্তভোগী তারা বিষয়টি ভাল করেই বুঝেন। তবু বিষয়টি আরো পরিস্কার করার লক্ষ্যে একটি উদাহরণ দিচ্ছি:

জনৈক আমেরিকান নারী, তিনি তার নিজস্ব অভিজ্ঞতার আলোকে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন যার নাম 'আপনার মত একজন স্মার্ট নারী বাড়িতে বসে কী করছে?' উক্ত ভদ্র মহিলার বক্তব্যের সারসংক্ষেপ তার ভাষায় এই যে, আমার ঘরে থাকার ইচ্ছা কখনোই ছিল না, আমি রীতিমত এক কোম্পানির চাকুরে ছিলাম। ৩৩ বছর বয়সে আমার ঘরে একটি ছেলে সন্তান জন্ম নেয়। ওকে সামলাতে গিয়ে আমি চাকরি ছেড়ে দিতে বাধ্য হই। কিছুদিন যেতে না যেতেই আর্থিক অনটনের সম্মুখীন হয়ে দ্বিতীয়বার চাকরিতে ফিরে যাই। এ অবস্থায় বিকেল এবং সপ্তাহান্তের ছুটির দিনের সময়টুকু কেবল বাচ্চাকে দিতে সক্ষম হই। এ সামান্য সময়টুকু বাচ্চার জন্য কখনোই যথেষ্ট ছিল না। তাই একটা নার্সারি খুঁজে বের করে ওকে সেখানে রেখে আসি। নার্সারিটি অসম্পূর্ণ ভেবে একমাস পরেই বাচ্চাকে বাসায় নিয়ে আসি। দ্বিতীয়বারের মতো চাকরি ছেড়ে ঘরে বসে বাচ্চা সামলাতে আরম্ভ করি। দু'বছর সময় একটি উৎকৃষ্ট নার্সারির তালাশেই কেটে যায়; কিন্তু ততক্ষণে আমি দ্বিতীয় সন্তানের মা হয়ে বসি। আবারও একটা চাকরিতে ফিরে যাই। বাচ্চা দুটোকে একটা ঘরোয়া ধরনের নার্সারিতে রেখে অফিস করতে যাই। কিন্তু সেখানেও আমার কাঙ্খিত শিশুসেবা খোঁজে না পেয়ে হতাশ হই। পরিশেষে বাসায় বসে করার মতো একটি চাকরি খোঁজে নেই। আমি বাচ্চাদের নিয়ে যে তিক্ত অভিজ্ঞতার শিকার হই তা আমাকে একটি বিশেষ নৈতিক শিক্ষায় ঋদ্ধ করে। আর তা হল, আপনি যত আইন-ই প্রণয়ন করুন না কেন এবং যত পয়সাই খরচ করুন না কেন তা দিয়ে একজনের প্রতি অন্যজনের হৃদ্যতা-ভালোবাসা কখনোই সৃষ্টি করা যায় না।

আমি এমন এক ব্যক্তির তালাশে ছিলাম যিনি হবেন স্নেহী, প্রীতিপূর্ণ, দরদী, হৃদয়বিশিষ্ট, রসিক মেজাজের ও তৎপর। একজন সজীব হৃদয়বিশিষ্টি ব্যক্তি যিনি আমার বাচ্চাদের নৈতিকতাকে সুষমামণ্ডিত করবে। কৌতূহলোদ্রেককর পর্যটনে ওদেরকে নিয়ে বের হবে। ওদের প্রতিটি ছোট-ছোট প্রশ্নের উত্তর দেবে। ওদেরকে দুলিয়ে দুলিয়ে মিষ্টি ঘুম পাড়াবে। কিন্তু আস্তে আস্তে এবং বেদনাদায়কভাবে আমি এ তিক্ত সত্য পর্যন্ত পৌঁছেছি যে, আমি যার তালাশে মাসের পর মাস কাটিয়েছি সে তো আমি ভিন্ন অন্য কেউ নয়। এটাই হচ্ছে সে কাজ যা আমার মতো একজন স্মার্ট মেয়ে ঘরে বসে করছে।

এ ঘটনা থেকে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে যত টাকাই দেওয়া হোক না কেন সন্তানের প্রতি মাতা-পিতার যে মমত্ববোধ তা ক্রয় করা কখনো সম্ভব নয়। ফলে মাতৃপিতৃসুলভ মমত্ববোধ দিয়ে যথার্থরূপে সন্তানকে তালিম-তরবিয়তে ভূষিত করা, মানুষের মতো মানুষ করা কল্পনা বৈ অন্য কিছু হবে না।

বর্তমান যুগে অনেক মাতা-পিতাকে নিজের ছেলে-সন্তানের ব্যাপারে খুবই উদাসীন-বেপরোয়া হতে দেখা যায়। ফলে সন্তান যখন বখে যায়, ধর্মচ্যুত হয়ে অনাকাঙ্খিত জীবনযাপন শুরু করে, তখন হয়তো তাদের সম্বিত ফিরে আসে। আর সেসময় আক্ষেপ-অনুশোচনায়, মানসিক যাতনায় কালাতিপাত ছাড়া অন্য কোনো উপায় থাকে না। তখন হয়তো শুধরানোর সময় অবলীলায় পেরিয়ে যায়। অতীতের প্রতি হতাশার দৃষ্টিতে তাকিয়ে যন্ত্রণাবিদ্ধ হৃদয়ে দিবস-রজনী যাপন করতে বাধ্য হতে হয়। শুধু যে পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী জীবন আফসোস আক্ষেপে কাটাতে হয় তাই নয়, সময়ের কাজ সময়ে না করার কারণে, গচ্ছিত এক আমানতের খিয়ানত করার কারণে, একটি মানবাত্মাকে ধ্বংসের মুখে অবলীলায় ঠেলে দেওয়ার কারণে পরকালীন জীবনে মাতা-পিতাকে জবাদিহিতার সম্মুখীন হওয়া একটি দুর্পার ঘটনা।

বর্তমানে অবশ্য অনেক মাতা পিতা পড়ন্ত বিকেলে এসেও সম্বিত ফিরে পান না; কেননা তারা নিজেরাই অধার্মিকতাকে জীবনপথ হিসেবে বেছে নিয়েছেন। এরূপ ব্যক্তিদের নিজেদের পাপের বোঝা তো বহন করতেই হবে, সাথে সাথে তাদের কাছে গচ্ছিত আমানত, তাদেরই জীবনাচার, কৃতকর্মের কারণে ধ্বংস হয়েছে, পাপ ও অন্যায়ের পথ বেছে নিয়ে, আল্লাহ-বিমুখ হয়েছে, পরকাল বিমুখ হয়েছে। এ কারণে তাদেরকে অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হতে হবে।

সে হিসেবে মাতা-পিতাকে তাদের কাছে গচ্ছিত আমানতের যথার্থ সম্মান করার স্বার্থে, নিজ সন্তানদের কাঙ্খিত মানবিক গুনাবলিতে ঋদ্ধ করে গড়ে তোলার স্বার্থে, নিজদেরকেও আল্লাহর আদেশ নিষেধের সীমানায় বেঁধে নিতে হবে, সন্তানদেরকেও আল্লাহর দেয়া মৌল প্রকৃতি (ফিতরত)-এর স্বচ্ছতা বজায় রেখে প্রকৃত অর্থে মর্দে মুমিন করে গড়ে তুলতে হবে।

সন্তানের দীন-ধর্ম, আদর্শ, মনোগঠন মাতাপিতার আদলে গড়ে উঠে। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্পষ্ট একটি হাদীস রয়েছে।

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« ما من مولود يولد إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء ؟ ثم يقول أبو هريرة : فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ، ذلك الدين القيم ».

“সন্তান কেবল ফিতরত (ইসলাম)-এর উপর জন্ম লাভ করে, অতঃপর তার মাতা-পিতা তাকে ইয়াহূদী অথবা নাসারা অথবা অগ্নিপূজক বানায়, যেমনি পশু পূর্ণাঙ্গ-দেহী পশু জন্ম দেয়, যাতে কি কোনো নাক কর্তিত (খুঁতবিশিষ্ট) দেখতে পাও? এরপর আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন: আল্লাহর ফিতরত যার ওপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন”

সন্তান একটি পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সন্তানকে কেন্দ্র করেই বরং যাপিত হয় অনেক পরিবারের দিবস রজনী, পরিবারের সকল দৌড়ঝাঁপের কেন্দ্রীয় টার্গেট থাকে সন্তানের নিরাপদ ভবিষ্যৎ নির্মাণ। আর যেহেতু সন্তানের ইহজাগতিক জীবনের স্বাচ্ছ্যন্দের তুলনায় পরজাগতিক শাশ্বত জীবনের স্বাচ্ছ্যন্দের গুরুত্ব অধিক; কেননা সে জীবনে জাহান্নামের প্রজ্বলিত আগুনে যাকে নিক্ষেপ করা হবে, তার দুঃখ-যন্ত্রণা, কষ্ট-যাতনার কোনো অন্ত থাকবে না। না পারবে কেউ তার ওপর আরোপিত আযাবকে সামান্যতম লাঘব করতে। তাই তো পরিবারের সদস্যদেরকে, যাদের মধ্যে স্নেহাস্পদ ছেলে সন্তানরা নিশ্চয় অন্যতম, পরকালের নারকীয় আযাব থেকে বাঁচানোর জন্য সকল প্রকার সতর্কতা অবলম্বন সর্বোচ্চ গুরুত্ব পাওয়া অত্যাবশ্যক। আল্লাহ বলেন:

[يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ ﴾ [التحريم: ٦﴿

“হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে আগুন হতে বাঁচাও, যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর।” [সূরা আত-তাহরীম, আয়াত: ৬]

আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু “তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে আগুন হতে বাঁচাও”-এর ব্যাখ্যা করেছেন এ বলে যে, ‘তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবারকে যা কিছু উত্তম তা শেখাও’

ইমাম ফখরুদ্দিন রাযী বলেছেন: “তোমরা নিজেদেরকে বাঁচাও”-এর অর্থ আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন তা থেকে দূরে থেকে নিজেদেরকে বাঁচাও।

ইমাম মুকাতিল উল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন: ‘মুসলিম ব্যক্তি নিজেকে ও তার পরিবারকে শিষ্টাচারে দীক্ষিত করে তুলবে, অতঃপর যা কিছু উত্তম তার নির্দেশ দেবে, ও যা কিছু অনুত্তম তা থেকে বারণ করবে।’

তাফসীরে কাশশাফে বলা হয়েছে: “তোমরা নিজেদেরকে বাঁচাও”-এর অর্থ গুনাহ বর্জন করে ও ইবাদত আনুগত্যের কাজগুলো করে তোমরা নিজেদেরকে বাঁচাও। আর পরিবারকে বাঁচানোর অর্থ: তাদের হিসেব নাও যে ব্যাপারে তুমি নিজের হিসেব নিয়ে থাক।’

সে হিসেবে সন্তানকে মানুষ করতে, সংশোধন করতে, সভ্য-ভদ্র করতে নিরচ্ছিন্নভাবে চেষ্টা করে যেতে হবে। কোনটা উত্তম, কোনটা অনুত্তম তা শেখাতে হবে। তাদের ভুলত্রুটি শুদ্ধ করার প্রচেষ্টায় যেন ছন্দপতন না ঘটে তার প্রতি অচ্ছেদ্য নজর রাখতে হবে। আর এটাই নবী-রাসূলগণের পদ্ধতি। নূহ আলাইহিস সালাম তার ছেলেকে ঈমানের দাওয়াত দিয়েছেন। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তার ছেলেদেরকে অদ্বিতীয় আল্লাহর ইবাদাত-আরাধনার উপদেশ করেছেন।

ইমাম নববী রহ. বুস্তানুল আরেফিন কিতাবে (দ্রঃ পৃষ্ঠা ৪৫) ইমাম শাফে‘ঈ রহ. থেকে বর্ণনা করে বলেন, তিনি ফুযাইলের উদ্‌ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করেন যে, নবী দাউদ আলাইহিস সালাম একদা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে বললেন, ‘হে আল্লাহ! আপনি আমার জন্য যেমন ছিলেন, তেমনি আমার ছেলের ক্ষেত্রেও হবেন।

(জবাবে) আল্লাহ তা‘আলা অহী পাঠিয়ে বললেন: হে দাউদ! তুমি তোমার ছেলেকে বলো, সে যেন আমার জন্য তোমার মতো হয়, তাহলে আমি তোমার প্রতি যেরূপ ছিলাম তার প্রতিও সেরূপ হব।

এ কারণেই ইমাম গাযালী রহ. তার (হে বৎস) গ্রন্থে বলেন: তরবিয়তের অর্থ অনেকটা কৃষকের মতো; যে তার ফসলের জমিন থেকে কাঁটা ও আগাছা উপড়ে ফেলে দূরে নিক্ষেপ করে। উদ্দেশ্য তার ফসলের চারাগুলো যাতে হৃষ্টপুষ্ট হয়ে সুন্দরভাবে বেড়ে উঠতে সক্ষম হয়।

মাতা-পিতার দায়িত্বের ব্যাপারে ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম খুব উপকারী একটি মন্তব্য করেছেন, তিনি বলেন: কয়েকজন আহলে ইলম তথা জ্ঞানবান ব্যক্তি বলেছেন যে, বিচার দিবসে প্রথমে পিতাকে তার সন্তান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। আর এটা হবে সন্তানকে তার পিতা সম্পর্কে প্রশ্ন করার পূর্বেই। কারণ, পিতার যেমন সন্তানের ওপর অধিকার রয়েছে, তেমনি সন্তানেরও পিতার ওপর অধিকার রয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

“আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার প্রতি সুন্দরতম আচরণ (ইহসান) করার উপদেশ দিয়েছি।” [সূরা আল-‘আনকাবুত, আয়াত: ১৯]

আল কুরআনে সন্তানকে মাতা-পিতার প্রতি দায়িত্বশীল হওয়ার ব্যাপারে উপদেশ, মাতা-পিতাকে সন্তানের প্রতি দায়িত্বশীল হওয়ার নির্দেশের পরে এসেছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

[﴿وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ خَشۡيَةَ إِمۡلَٰقٖۖ نَّحۡنُ نَرۡزُقُهُمۡ وَإِيَّاكُمۡۚ إِنَّ قَتۡلَهُمۡ كَانَ خِطۡـٔٗا كَبِيرٗا ٣١﴾ [الاسراء: ٣١

“তোমরা তোমাদের সন্তানকে দারিদ্র্যের ভয়ে হত্যা করো না, নিশ্চয় আমি তাদেরকে রিযিক দিই এবং তোমাদেরকেও। নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা বড় অন্যায়।“ [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৩১]

ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম আরো বলেন, যে ব্যক্তি তার সন্তানকে উপকারী ইলম শেখানোর ব্যাপারে উদাসীনতা দেখাল, তাকে সে এমনিতেই ছেড়ে দিল, তার প্রতি সে অবিচার করল। আর অধিকাংশ ছেলে-মেয়ের নষ্ট হওয়ার কারণ পিতার অবহেলা, উদাসীনতা, মাতা-পিতা কর্তৃক তাদেরকে দীনের আবশ্যক বিষয়সমূহ, সুন্নতকর্মসমূহ সম্পর্কে মূর্খ রাখা। আর এভাবেই তারা ছোট কালেই বাচ্ছাদেরকে হারিয়ে ফেলে, অতঃপর বড় হয়ে না পারে তারা নিজেদেরও কোনো উপকার করতে, আর না আসে মাতা-পিতার কোনো কল্যাণে।

বলা হয় যে, এক ব্যক্তি তার ছেলেকে মাতা-পিতার প্রতি অবিচার করায় অভিযোগ করে গালমন্দ করছিল। প্রত্যুত্তরে ছেলে বলল: আব্বাজান! আমি যখন ছোট ছিলাম আপনি আমার প্রতি অবিচার করেছেন। তাই বড় হয়ে আমিও আপনার প্রতি অবিচার করলাম। ছোটকালে আপনি আমাকে ধ্বংস করেছেন, আমিও আপনাকে বৃদ্ধ বয়সে ধ্বংস করলাম।

পরিশেষে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, যে ব্যক্তি তার সন্তানদেরকে ঈমানে-আমলে, আখলাকে-চরিত্রে বলীয়ান করে সঠিক অর্থে মানুষ করতে ব্যর্থ হলো সে তার জীবনের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মিশনে ব্যর্থ হলো। তাই প্রতিটি মাতা-মাতারই উচিত তাদের জীবনের এ গুরুত্বপূর্ণ মিশনে মরিয়া হয়ে চেষ্টা করে যাওয়া। প্রয়োজনে অন্যসব ব্যস্ততা সংকুচিত করে সন্তান লালনে যথেষ্ট পরিমাণ সময় দেওয়া। আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাওফীক দান করুন। আমীন।

সন্তান প্রতিপালনে ইসলামের প্রেরণা

ইসলাম যেসব দিক বিবেচনায় নিয়ে মানুষকে বিবাহে উদ্‌বুদ্ধ করে সন্তান জন্ম দেয়া তার অন্যতম প্রধান কারণ। সন্তানের মাধ্যমে বিবাহিত জীবনের স্বার্থকতা ফুটে ওঠে। বিবাহিত মানুষ মাত্রই সন্তান কামনা করেন। বিশেষত নারীদের দৃষ্টিতে। আপন জন্মের স্বার্থকতাই সন্তান জন্ম দেবার মধ্যে বলে মনে করেন নারীরা। নিঃসন্তান দম্পতিরাই জানেন সন্তান কতটা আরাধ্য। মানুষের স্রষ্টা হিসেবে আল্লাহ তা'আলা তার স্বভাব সম্পর্কে সবচে ভালো জানেন। তাই তিনি পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন,

[ﱡٱلۡـَٰٔنَ بَٰشِرُوهُنَّ وَٱبۡتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمۡۚ ﱠ [البقرة:187

'অতএব, এখন তোমরা তাদের সাথে মিলিত হও এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা লিখে দিয়েছেন, তা অনুসন্ধান কর।' {সূরা আল-বাকারা : ১৮৭}

ইবন আব্বাস, মুজাহিদ, ইকরামা, হাসান বসরী, সাদ্দী ও যাহহাক বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য সন্তান।

আজ পশ্চিমা প্রচারণার যুগে অধিক সন্তান নেয়াকে শুধু নিরুৎসাহিতই করা হচ্ছে না। বেশি সন্তান জন্মদানকারী দম্পতিকে অপরাধীর দৃষ্টিতেও দেখা হচ্ছে কোথাও কোথাও। অথচ মানবতার কল্যাণের বার্তাবাহী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের অধিক সন্তান নিতে সুস্পষ্টভাবে অনুপ্রাণিত করছেন।

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ ، وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا ، وَيَقُولُ : تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ ، إِنِّي مُكَاثِرٌ « الأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিয়ে করতে উদ্‌বুদ্ধ করতেন এবং বৈরাগ্য থেকে তীব্রভাবে বারণ করতেন। তিনি বলতেন, 'তোমরা অধিক সন্তানদানকারী স্বামীভক্ত নারীদের বিয়ে করো। কেননা কিয়ামতের দিন আমি তোমাদের (সংখ্যা) নিয়ে নবীদের সামনে গর্ব করবো।' [মুসনাদ আহমাদ : ১২৬৩৪।]

মা'কাল বিন ইয়াসার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لاَ تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ : لاَ. ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ : «تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ».

‘নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এক ব্যক্তি এলো। সে বলল, একজন কুলীনা ও সুন্দরী মহিলা পেয়েছি, তবে সে সন্তান জন্ম দিতে পারে না। আমি কি তাকে বিয়ে করবো? তিনি বললেন, ‘না’। অতপর তাঁর কাছে দ্বিতীয়বার এসে পরামর্শ চাইলেন। আবার তিনি বারণ করলেন। সে তৃতীয়বার তাঁর কাছে এলে সেবারও তিনি তাকে নিষেধ করলেন। অতপর তিনি বললেন, ‘তোমরা অধিক সন্তানদানকারী স্বামীভক্ত নারীদের বিয়ে করো। কেননা কিয়ামতের দিন আমি তোমাদের (সংখ্যা) নিয়ে গর্ব করবো।’ [আবূ দাউদ : ২০৫২; নাসায়ী : ৩২২৭]

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

« النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي ، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي , فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ ، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاء».

‘বিবাহ আমার সুন্নত। যে আমার সুন্নত মোতাবেক কাজ করে না সে আমাদের দলভুক্ত নয়। তোমরা বিবাহ করো। কেননা আমি তোমাদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে অন্যান্য উম্মতের সামনে গর্ব করব। অতএব যার যোগ্যতা আছে সে যেন বিয়ে করে। আর যার নাই সে যেন সিয়াম পালন করে। কেননা, সাওম একে প্রশমিত করে।’ [ইবন মাজা : ১৮৪৬]

ইদানীং তথাকথিত অনেক আধুনিক ব্যক্তিকে দেখা যায় বিয়ের প্রতি তারা উন্নাসীক। এমনকি অনেক ধার্মিক ব্যক্তিকেও দেখা যায় বিবাহিত জীবনকে কেবল ‘ঝামেলা’ (?) হিসেবে দেখেন। তাদের বিয়েতে উদ্‌বুদ্ধ হবার জন্য সন্তান গ্রহণের ফযীলতসম্বলিত হাদীসগুলো হতে পারে দারুণ প্রেরণা। কেননা বিয়ে না করলে এসব ফযীলত তারা কখনো অর্জন করতে পারবেন না। যেমন :

আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الْجَنَّةِ ، فَيَقُولُ : يَا رَبِّ ، أَنَّى لِي هَذِهِ ؟ فَيَقُولُ : بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَك».

‘জান্নাতে নেক ব্যক্তির মর্যাদা বৃদ্ধি করা হবে। সে বলবে, হে রব, কিসের সৌজন্যে আমার এ মর্যাদা? আল্লাহ বলবেন, তোমার জন্য তোমার সন্তানের ইস্তেগফারের বদৌলতে।’ [ইবন মাজা : ১০৬১৮]

আবূ হাসসান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قُلْتُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ إِنَّهُ قَدْ مَاتَ لِيَ ابْنَانِ فَمَا أَنْتَ مُحَدِّثِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَدِيثٍ تُطَيِّبُ بِهِ أَنْفُسَنَا عَنْ مَوْتَانَا قَالَ قَالَ نَعَمْ «صِغَارُهُمْ دَعَامِيصُ الْجَنَّةِ يَتَلَقَّى أَحَدُهُمْ أَبَاهُ أَوْ قَالَ أَبَوَيْهِ فَيَأْخُذُ بِثَوْبِهِ أَوْ قَالَ بِيَدِهِ كَمَا آخُذُ أَنَا بِصَنِفَةِ ثَوْبِكَ هَذَا فَلَا يَتَنَاهَى أَوْ قَالَ فَلَا يَنْتَهِي حَتَّى يُدْخِلَهُ اللَّهُ وَأَبَاهُ الْجَنَّةَ».

‘আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর উদ্দেশে আমি বললাম আমার দু’টি সন্তান মারা গেছে। আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আমাদের কোনো হাদীস শোনাতে পারেন যা মৃতদের ব্যাপারে আমাদের মনটাকে খুশি করে দেবে? হাসসান বলেন, আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হ্যা। ‘তাদের ছোটরা জান্নাতে মুক্তবিচরণশীল। এদের কেউ তার পিতা অথবা (তিনি বলেছেন) পিতামাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। অতপর তার কাপড় অথবা (বলেছেন) হাত ধরবে

যেমন আমি তোমার এ কাপড়ের প্রান্ত ধরেছি। অতপর সে ছাড়বে না অথবা ক্ষান্ত হবে না যাবৎ না আল্লাহ তার বাবাকে জান্নাতে প্রবেশ করান।’ [মুসলিম : ৪৭৬৯; মুসনাদ আহমদ : ১০৩৩১]

মুয়াবিয়া বিন কুররা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন,

أَنَّ رَجُلاً كَانَ يَأْتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ ابْنٌ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «أَتُحِبُّهُ ؟» فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَحَبَّكَ اللَّهُ كَمَا أُحِبُّهُ ، فَفَقَدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ «مَا فَعَلَ ابْنُ فُلاَنٍ ؟» قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَاتَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَبِيهِ : «أَمَا تُحِبُّ أَنْ لاَ تَأْتِيَ بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ ، إِلاَّ وَجَدْتَهُ يَنْتَظِرُكَ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلَهُ خَاصَّةً أَمْ لِكُلِّنَا ؟ قَالَ : بَلْ لِكُلِّكُم».

‘এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসতো। তার সঙ্গে থাকতো তার একটি ছেলে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, ‘তুমি কি তাকে ভালোবাসো?’ সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ আপনাকেও তেমন ভালোবাসুন যেমন আমি তাকে ভালোবাসি। পরবর্তীতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে (কয়েকদিন) দেখতে না পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, অমুকের সন্তানের খবর কী? সাহাবীরা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, সে মারা গেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তার পিতার উদ্দেশে বললেন, তুমি কি এমনটি পছন্দ করো না যে জান্নাতের যে দরজাতেই তুমি যাবে সেখানে তাকে তোমার জন্য অপেক্ষমান পাবে?’ এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল, এটা কি শুধু ওই ব্যক্তির জন্য নাকি আমাদের সবার জন্য? তিনি বললেন, ‘বরং তোমাদের সবার জন্য’।’ [মুসনাদ আহমদ : ১৫৫৯৫]

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : «مَنْ كَانَ لَهُ فَرَطَانِ مِنْ أُمَّتِي ، دَخَلَ الْجَنَّةَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ : بِأَبِي ، فَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطٌ ؟ فَقَالَ : وَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطٌ يَا مُوَفَّقَةُ قَالَتْ : فَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَرَطٌ مِنْ أُمَّتِكَ ؟ قَالَ : فَأَنَا فَرَطُ أُمَّتِي ، لَمْ يُصَابُوا بِمِثْلِي».

‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, ‘আমার উম্মতের মধ্যে যার দু’দুটি সন্তান বিয়োগ ঘটবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমার পিতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোন, যার একটি সন্তান বিয়োগ ঘটবে (সেও কি এমন বিনিময় পাবে)? তিনি বললেন, ‘হে সুন্দরপ্রশ্নের তাওফীক প্রাপ্তা, যার একটি সন্তান বিয়োগ ঘটবে তার জন্যও একই (বিনিময়) রয়েছে। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আপনার উম্মতের মধ্যে যার কোনো সন্তানই বিয়োগ ঘটবে না? তিনি বললেন, আমিই আমার উম্মতের মৃত সন্তান, তারা আমার মতো আর কাউকে পাবে না।’ [মুসনাদ আহমদ : ৩০৯৮; শুয়াবুল ঈমান : ৯২৯৫]

আবূ সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ الرِّجَالُ بِحَدِيثِكَ فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَوْمًا نَأْتِيكَ فِيهِ تُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ قَالَ «اجْتَمِعْنَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا» فَاجْتَمَعْنَ فَأَتَاهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَّمَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ «مَا مِنْكُنَّ مِنْ امْرَأَةٍ تُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَيْهَا مِنْ وَلَدِهَا ثَلَاثَةً إِلَّا كَانُوا لَهَا حِجَابًا مِنْ النَّارِ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ»

‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদের উদ্দেশে বলেন, একজন মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, পুরুষরা তো আপনার

হাদীস শুনে যায়। অতএব আপনার পক্ষ থেকে আমাদের জন্যও একটি দিন নির্ধারণ করুন। আমরা সেদিন আপনার কাছে আসবো, যাতে আল্লাহ আপনাকে যা শিখিয়েছেন আমাদেরকেও তার কিছু শিখিয়ে দেন। তিনি বললেন, 'তোমরা অমুক অমুক দিনে সমবেত হবে। অতপর তারা জমায়েত হলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে তাশরীফ রাখলেন। আল্লাহ তাঁকে যা শিখিয়েছেন তা থেকে তাদের শিক্ষা দিলেন। এক পর্যায়ে তিনি তাদের বললেন, 'তোমাদের যে কারও তিনটি সন্তান মারা গিয়ে থাকে তার জীবদ্দশায়, তবে তারা তার জন্য (জান্নামের) আগুন আড়ালকারী হবে। এক মহিলা জিজ্ঞেস করলেন, যদি দু'টি দু'টি দু'টি করে সন্তান মরে গিয়ে থাকে তবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, দু'টি সন্তানও (অগ্নি থেকে আড়ালকারী হবে।) [মুসলিম : ৪৭৬৮; বুখারী : ১১৯২]

আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,

«مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ لَهُ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ ، فَتَمَسُّهُ النَّارُ ، إِلاَّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ».

'এমন কোনো মুসলিম নেই তিনটি সন্তান মারা যাবে অপ্রাপ্ত বয়সে আর তাকে আগুন স্পর্শ করবে। হ্যা, সামান্য পরিমাণ হতে পারে [মুসনাদ আহমদ : ১০১২০]

আনাস বিন মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَا مِنَ النَّاسِ مُسْلِمٌ يَمُوتُ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُم»

'মুসলিমদের মধ্যে যে কোনো ব্যক্তির যদি তিনটি সন্তান মারা যায় নাবালক অবস্থায়, আল্লাহ অবশ্যই তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। এটি করবেন তিনি তাদের প্রতি ওই ব্যক্তির মমতার কারণে।' [বুখারী : ১৩৮১]

আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَتَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- بِصَبِيٍّ لَهَا فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ لَهُ فَلَقَدْ دَفَنْتُ ثَلاَثَةً قَالَ «دَفَنْتِ ثَلاَثَةً» قَالَتْ «نَعَمْ. قَالَ « لَقَدِ احْتَظَرْتِ بِحِظَارٍ شَدِيدٍ مِنَ النَّارِ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একজন মহিলা তার বাচ্চাকে নিয়ে এসে বলল, হে আল্লাহর নবী, আপনি এর জন্য দু'আ করুন (যাতে এ জীবিত থাকে)। কেননা, আমি (এর আগে) তিনজনকে দাফন করেছি। তিনি বললেন, তুমি কি তিনজনকে দাফন করেছ? মহিলা বলল, জী। তিনি বললেন, তুমি তো কঠিন বন্ধনী দিয়ে নিজেকে আগুন থেকে বাঁচিয়ে নিয়েছো।' [মুসলিম : ৬৮৭১; নাসায়ী : ৮৮৭৭; মুসনাদ আহমদ : ৯৪২৭]

আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ : صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ ، وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ ، وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ.»

'মানুষ যখন মরে যায়, তখন তার সব আমল বন্ধ হয়ে যায় তবে সে তিনটি (উৎস থেকে নেকী প্রাপ্তি বন্ধ হয় না) : সাদাকায়ে জারিয়া, এমন কোনো ইলম যা থেকে মানুষ উপকৃত হয় এবং সুসন্তান যে তার জন্য দু'আ করে।' [তিরমিযী : ১৩৭৬; মুসলিম : ১৬৩১; ইবন খুযাইমা : ২৪৯৪]

কন্যা জন্মে নাখোশ হওয়ার নিন্দা

অনেক ভাইকে দেখা যায়, কন্যা সন্তান জন্ম নিলে তারা বেজায় নাখোশ হন। তারা কি ভেবে দেখেছেন তাদের এ মনোভাব কাদের সঙ্গে মিলে যায়? কন্যা সন্তান জন্ম নিলে তাতে রুষ্ট হওয়া মূলত জাহেলী চরিত্রের প্রকাশ, আল্লাহ তা'আলা যার সমালোচনা করেছেন পবিত্র কুরআনে। ইরশাদ হয়েছে :

﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلۡأُنثَىٰ ظَلَّ وَجۡهُهُۥ مُسۡوَدّٗا وَهُوَ كَظِيمٞ ٥٨ يَتَوَٰرَىٰ مِنَ ٱلۡقَوۡمِ مِن سُوٓءِ مَا بُشِّرَ بِهِۦٓۚ أَيُمۡسِكُهُۥ عَلَىٰ هُونٍ أَمۡ يَدُسُّهُۥ فِي ٱلتُّرَابِۗ أَلَا سَآءَ مَا يَحۡكُمُونَ ٥٩ ﴾ [النحل:58-59]

'আর যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয়; তখন তার চেহারা কালো হয়ে যায়। আর সে থাকে দুঃখ ভারাক্রান্ত। তাকে যে সংবাদ দেয়া হয়েছে, সে দুঃখে সে কওমের থেকে আত্মগোপন করে। আপমান সত্ত্বেও কি একে রেখে দেবে, না মাটিতে পুঁতে ফেলবে? জেনে রেখ, তারা যা ফয়সালা করে, তা কতই না মন্দ!' {সূরা আন-নাহল : ৫৮-৫৯}

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কন্যাদের বড় ভালোবাসতেন। মেয়েরা ছিল তাঁর আদরের দুলালী। আজীবন তিনি কন্যাদের ভালো বেসেছেন এবং কন্যা সন্তান প্রতিপালনে উদ্‌বুদ্ধ করেছেন। আনাস বিন মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ . وَضَمَّ أَصَابِعَه».

'যে ব্যক্তি সাবালক হওয়া পর্যন্ত দু'টি কন্যার ভার বহন করবে কিয়ামতের দিন আমি আর সে আবির্ভূত হব। একথা বলে তিনি তার হাতের দুই আঙ্গুল একসঙ্গে করে দেখান।' [মুসলিম : ৬৪৬৮; তিরমিযী : ১৯১৪; ইবন আবী শাইবা : ২৫৯৪৮]

আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

جَاءَتْنِى امْرَأَةٌ وَمَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا فَسَأَلَتْنِى فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِى شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا فَأَخَذَتْهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا شَيْئًا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ وَابْنَتَاهَا فَدَخَلَ عَلَىَّ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- فَحَدَّثْتُهُ حَدِيثَهَا فَقَالَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم: «مَنِ ابْتُلِىَ مِنَ الْبَنَاتِ بِشَىْءٍ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ»

'আমার কাছে এক মহিলা এলো। তার সঙ্গে তার দুই মেয়ে। আমার কাছে সে কিছু প্রার্থনা করল। সে আমার কাছে একটি খেজুর ছাড়া কিছুই দেখতে পেল না। আমি তাকে সেটি দিয়ে দিলাম। সে তা গ্রহণ করল এবং তা দুই টুকরো করে তার দুই মেয়ের মাঝে বণ্টন করে দিল। তা থেকে সে কিছুই খেল না। তারপর সে ও তার মেয়ে দু'টি উঠে পড়ল এবং চলে গেল। ইত্যবসরে আমার কাছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এলেন। আমি তাঁর কাছে ওই মহিলার কথা বললাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'যাকে কন্যা দিয়ে কোনো কিছুর মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয় আর সে তাদের প্রতি যথাযথ আচরণ করে, তবে তা তার জন্য আগুন থেকে রক্ষাকারী হবে।' [মুসলিম : ৬৮৬২; মুসনাদ আহমদ : ২৪৬১৬]

কন্যা সন্তান প্রতিপালনে শুধু পিতাকেই নয়; ভাইকেও উদ্‌বুদ্ধ করা হয়েছে। বোনের কথাও বলা হয়েছে হাদীসে। যেসব ভাই মনে করেন মেয়ে বা বোনের পেছনে টাকা খরচ করলে ভবিষ্যতের

তার কোনো প্রাপ্তি নেই তারা আসলে ভুলের মধ্যে আছেন। আবূ সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لَا يَكُونُ لِأَحَدٍ ثَلَاثُ بَنَاتٍ، أَوْ ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ، أَوْ ابْنَتَانِ، أَوْ أُخْتَانِ، فَيَتَّقِي اللهَ فِيهِنَّ وَيُحْسِنُ إِلَيْهِنَّ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ»

'কারও যদি তিনটি মেয়ে কিংবা বোন থাকে অথবা দুটি মেয়ে বা বোন থাকে আর সে তাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে এবং তাদের সঙ্গে সদাচার করে, তবে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে।' [মুসনাদ আহমদ : ১১৪০৪; বুখারী, আদাবুল মুফরাদ : ৭৯]

আবূ সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَنْ كَانَ لَهُ ثَلاَثُ بَنَاتٍ أَوْ ثَلاَثُ أَخَوَاتٍ أَوِ ابْنَتَانِ أَوْ أُخْتَانِ فَأَحْسَنَ صُحْبَتَهُمْ ، وَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ وَاتَّقَى اللَّهَ فِيهِنَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ.»

'যার তিন মেয়ে অথবা তিনটি বোন কিংবা দুটি মেয়ে বা দুটি বোন রয়েছে, সে তাদের সঙ্গে সদাচার করে এবং তাদের (বিবিধ সমস্যায়) ধৈর্য ধারণ করে আর তাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে, সে জান্নাতে যাবে।' [মুসনাদ হুমাইদী : ৭৭২]

কন্যা সন্তান প্রতিপালনে যাতে বৈষম্য না করা হয়, বস্তুবাদী ব্যক্তিরা যাতে হীনমন্যতায় না ভোগেন, তাই তাদের কন্যা প্রতিপালনে ধৈর্য ধরার উপদেশ দেয়া হয়েছে। শোনানো হয়েছে পরকালে বিশাল প্রাপ্তির সংবাদ। আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« مَنْ كَانَتْ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ فَصَبَرَ عَلَى لَأْوَائِهِنَّ، وَعَلَى ضَرَّائِهِنَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ، زَادَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ يُونُسَ: فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاثْنَتَيْنِ ؟ قَالَ: وَاثْنَتَيْنِ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَوَاحِدَةً؟ قَالَ: وَوَاحِدَة»

'যার তিনটি কন্যাসন্তান থাকবে এবং সে তাদের কষ্ট-যাতনায় ধৈর্য ধরবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মুহাম্মদ ইবন ইউনূসের বর্ণনায় এ হাদীসে অতিরিক্ত অংশ হিসেবে এসেছে) একব্যক্তি প্রশ্ন করলো, হে আল্লাহর রাসূল, যদি দু'জন হয়? উত্তরে তিনি বললেন, দু'জন হলেও। লোকটি আবার প্রশ্ন করলো, যদি একজন হয় হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন, একজন হলেও।' [বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান : ৮৩১১]

আউফ বিন মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ يُنْفِقُ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَبِنَّ أَوْ يَمُتْنَ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّار»

'যার তিনটি মেয়ে রয়েছে, যাদের ওপর সে অর্থ খরচ করে বিয়ে দেয়া বা মৃত্যু পর্যন্ত, তবে তারা তার জন্য আগুন থেকে মুক্তির কারণ হবে।' [বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান : ৮৩১২]

আউফ বিন মালেক আশজায়ী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَا مِنْ عَبْدٍ يَكُونُ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ فَيُنْفِقُ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَبِنَّ أَوْ يَمُتْنَ إِلَّا كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ» فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، «وَاثْنَتَانِ ؟ قَالَ: «وَاثْنَتَانِ»

'যে বান্দার তিনটি মেয়ে রয়েছে, যাদের ওপর সে অর্থ খরচ করে বিয়ে দেওয়া অথবা মৃত্যু পর্যন্ত, তবে তারা তার জন্য আগুন থেকে মুক্তির কারণ হবে। তখন এক মহিলা বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, আর দুই মেয়ে? তিনি বললেন, 'দুই মেয়েও'।' [বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান : ৮৩১৩]

আবূ আম্মার আউফ বিন মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«أَنَا وَامْرَأَةٌ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ كَهَاتَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " وَجَمَعَ بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى " امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ آمَتْ مِنْ زَوْجِهَا، حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلَى أَيْتَامِهَا حَتَّى بَانُوا أَوْ مَاتُوا»

'আমি এবং গাল মলিনকারী মহিলা কিয়ামতের দিন এভাবে উঠব।' এ কথা বলে তিনি তাঁর তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুল একত্রিত করে দেখান। (আর গাল মলিনকারী হলেন) 'ওই মহিলা যিনি সুন্দরী ও সুবংশীয়া। তার স্বামী মারা গিয়েছেন। তথাপি তিনি তার এতিম সন্তানদের জন্য তাদের বিয়ে বা মরণ পর্যন্ত নিজেকে (কারো সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া থেকে) বিরত রেখেছেন'। [মুসনাদ আহমদ : ২৪০৫২; আবূ দাউদ : ৫১৫১; বুখারী, আদাবুল মুফরাদ : ৫১৪৯]

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَكُونُ لَهُ ابْنَتَانِ فَيُحْسِنُ إِلَيْهِمَا مَا صَحِبَهُمَا وَصَحِبَتَاهُ إِلَّا أَدْخَلَتَاهُ الْجَنَّةَ»

'যে কোনো মুসলিমের দুটি মেয়ে থাকবে আর সে তাদের সঙ্গে সদাচার করতে যতদিন সে তাদের সঙ্গে থাকবে এবং তারা যতদিন তার সঙ্গে থাকবে, তবে তারা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।' [বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান : ৮৩১৪; আবী ইয়া'লা, মুসনাদ : ২৫৭১]

মুহাম্মদ ইবন মুনকাদির থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«" مَنْ كَانَتْ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ أَوْ أَخَوَاتٍ فَكَفَّهُنَّ وَآوَاهُنَّ وَرَحِمَهُنَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ "، قَالُوا: أَوِ اثْنَتَانِ ؟ قَالَ: " أَوِ اثْنَتَانِ "، قَالَ: حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُمْ لَوْ قَالُوا: أَوْ وَاحِدَةً قَالَ: أَوْ وَاحِدَة»

'যার তিন তিনটি কন্যা অথবা বোন আছে আর সে তাদের থেকে অনিষ্ট থেকে রক্ষা করে, তাদের আশ্রয় দেয় এবং তাদের ওপর দয়া করে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'। সাহাবীরা বললেন, আর দু'জন? তিনি বললেন, দু'জনও। বর্ণনাকারী বলেন, এমনকি আমরা মনে করলাম যদি তারা বলতেন, আর একজন? তবে তিনি বলতেন, আর একজনও। [বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান : ৮৩১৫]

উকবা বিন আমর জুহানী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন,

«مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ، فَأَطْعَمَهُنَّ وَسَقَاهُنَّ وَكَسَاهُنَّ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّار»"

‘যার তিনটি কন্যা সন্তান থাকে আর সে তাদের ব্যাপারে ধৈর্য ধরে, তাদেরকে খাওয়ায়, পান করায় এবং তাদের পোশাকের ব্যবস্থা করে, তবে সে কন্যারা তার জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তির কারণ হবে।’ [বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান : ৮৩১৭; মুসনাদ আহমদ : ১৭৪০৩; আবী ইয়া‘লা, মুসনাদ : ১৭৬৪]

মনে রাখতে হবে, আজ যে অবিবেচক পিতা কন্যা সন্তান দেখে রাগান্বিত হচ্ছেন, কন্যার মাকে যাচ্ছে তাই গালমন্দ করছেন, কাল তিনি এর জন্য আফসোস করতে পারেন। ছেলেদের অবাধ্যতায় অতিষ্ঠ এ পিতাকে এ মেয়েই একদিন আমোদিত ও স্বার্থক পিতা বানাতে পারে। আমরা ভুলে যাই স্থূল দৃষ্টিতে অনেক কিছু মন্দ মনে হলেও অনেক সময় তা মঙ্গল বয়ে আনে। এ দিকে ইঙ্গিত করেই পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

[فَإِن كَرِهۡتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَيَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيۡرٗا كَثِيرٗا ١٩ ﴾ [النساء:19﴿

‘আর যদি তোমরা তাদেরকে অপছন্দ কর, তবে এমনও হতে পারে যে, তোমরা কোন কিছুকে অপছন্দ করছ আর আল্লাহ তাতে অনেক কল্যাণ রাখবেন।’ {সূরা আন-নিসা, আয়াত : ১৯}

মা-বাবার কর্তব্য

আমাদের অস্তিত্বের প্রতিটি কণা আল্লাহর দান। জীবনের প্রতিটি বিন্দু আল্লাহর দয়া। তাই আমাদের অস্তিত্ব ও জীবন আল্লাহর কাছে ঋণী। আমাদের উপর আল্লাহর অফুরন্ত নিআমতরাজির মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য একটি নিআমত হল আমাদের সন্তানেরা। নিঃসন্তান দম্পতি কিংবা সন্তানহারা মাকে জিজ্ঞেস করুন, বুঝতে পারবেন, সন্তান কত বড় নিআমত! আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেনÑ

وَ اللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَ حَفَدَةً وَّ رَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَ بِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ.

আল্লাহ তোমাদেরই মধ্য হতে তোমাদের জন্য স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের স্ত্রীদের থেকে তোমাদের জন্য পুত্র ও পৌত্রাদি সৃষ্টি করেছেন। আর ভালো-ভালো জিনিসের থেকে রিযিকের ব্যবস্থা করেছেন। তবুও কি তারা ভিত্তিহীন জিনিসের প্রতি ঈমান রাখবে আর আল্লাহর নিআমতসমূহের অকৃতজ্ঞতা করবে? সূরা নাহল (১৬) : ৭২

সম্পদের প্রাচুর্যে পূর্ণ একটি পরিবার। তবুও তারা বিষণ্ন। কারণ তাদের কোল উজ্জ্বল করেনি কোনো ফুটফুটে শিশুর নিষ্পাপ হাসি। আল্লাহ যাকে দান করেন সে-ই কেবল অধিকারী হতে পারে এ নিআমতের। ইরশাদ হয়েছে

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ، يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ، يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ. اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّ اِنَاثًا، وَ يَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا، اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ.

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহরই। তিনি যা চান সৃষ্টি করেন। যাকে চান কন্যা দেন এবং যাকে চান পুত্র দেন। অথবা দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই। আবার যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।সূরা শুরা (৪২) : ৪৯-৫০

সন্তান গুরুত্বপূর্ণ আমানত

সন্তান আল্লাহর দান। আল্লাহর পক্ষ থেকে বড় এক আমানত। আল্লাহ এর মাধ্যকে পরীক্ষা করেনÑ বান্দা এই আমানতের যথাযথ হেফাযত করে কি না। সন্তান-সন্ততির মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা বান্দাকে দুইভাবে পরীক্ষা করেন। এক. সন্তানের কারণে বান্দা আল্লাহর হুকুম লঙঘন করে কি না। দুই. বান্দা সন্তানকে আমানত মনে করে কি না এবং সে আমানতের হেফাযতে যত্নবান হয় কি না। আল্লাহ তাআলা বলেন

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَ اَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، وَّ اَنَّ اللهَ عِنْدَهٗۤ اَجْرٌ عَظِیْمٌ.

জেনে রেখ, তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য এক পরীক্ষা। আর মহা পুরস্কার রয়েছে আল্লাহরই কাছে। সূরা আনফাল (৮) : ২৮

ইমাম ইবনে জারীর তবারী রাহ. বলেন, আল্লাহ তাআলা মুমিন বান্দাদের লক্ষ করে বলছেন

واعلموا، أيها المؤمنون! إنما أموالكم التي خَوَّلَكُمُوها اللهُ، وأولادُكم التي وَهَبَها اللهُ لكم، اختبارٌ وبلاء، أَعْطاكُمُوها ليَختبرَكم بها ويَبتليَكم، لينظر كيف أنتم عاملون من أداء حق الله عليكم فيها، والانتهاء إلى أمره ونهيه فيها.

হে মুমিনগণ! জেনে রেখ, তোমাদেরকে যে ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি দান করেছি এসব তোমাদের জন্য পরীক্ষার বস্তু। এর মাধ্যমে তোমাদের আমি পরীক্ষা করব। এটা দেখার জন্য যে, সন্তান-সন্ততি ও অর্থ-কড়ির ক্ষেত্রে তোমরা আল্লাহর হক কতটুকু আদায় কর এবং দ্বীনের বিধিনিষেধ কী পরিমাণ মান্য কর।তাফসীরে তাবারী ১১/১২৬

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনÑ

أَلاَ كُلّكُمْ رَاعٍ وَكُلّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيّتِهِ،... وَالرّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيّتِهِ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْؤُولَةٌ عَنْهُمْ،... أَلاَ فَكُلّكُمْ رَاعٍ وَكُلّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيّتِه.

শুনে রাখো, তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। পুরুষ তার পরিবারের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। তাকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। নারী তার পরিবার, সন্তান-সন্ততির বিষয়ে দায়িত্বশীল, তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। তাকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।... জেনে রাখো, প্রত্যেক ব্যক্তিই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই তার অধীনস্তদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। সহীহ বুখারী, হাদীস ৭১৩৮; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ২৯২৮

আরেক হাদীসের ঘোষণা

ما مِن عبد اسْتَرْعاه اللهُ رعيّةً، فلم يَحُطْها بنصيحة، إلا لم يجدْ رائحة الجنة.

আল্লাহ তাআলা যদি বান্দাকে কারো দায়িত্বশীল বানান আর সে নিজ অধীনস্তদের কল্যাণের ব্যাপারে যত্নশীল না হয়, তাহলে সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। Ñসহীহ বুখারী, হাদীস ৭১৫০

মোটকথা, সন্তান-সন্ততি পিতা-মাতার নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে আমানত। তাদের ঈমান-আকীদা, বোধ-বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা, আমল-আখলাক, জীবন যাপন প্রভৃতির ব্যাপারে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেওয়া মাতা-পিতার কর্তব্য।

পিতা-মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য

সন্তান আল্লাহর পক্ষ থেকে নিআমত এবং পিতা-মাতার নিকট আমানত। পিতা-মাতার কর্তব্য হল, সন্তানকে আল্লাহর ফরমাবরদার বান্দা হিসাবে গড়ে তোলা এবং শয়তানের সবধরনের গোলামি থেকে দূরে রাখা। শয়তান চায়, প্রত্যেকটা মানবশিশুকে অঙ্কুরেই ধ্বংস করতে। জান্নাত থেকে বিতাড়িত হওয়ার সময়ই তার অঙ্গিকার ছিল আদমসন্তানকে বিপথগামী করা। তখন আল্লাহ তাআলা তাকে বলেছিলেন

وَ شَارِكْهُمْ فِی الْاَمْوَالِ وَ الْاَوْلَادِ وَعِدْهُمْ، وَ مَا یَعِدُهُمُ الشَّیْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا.

যাও তাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে অংশীদার হয়ে যাও এবং তাদেরকে যত পার প্রতিশ্রুতি দাও। বস্তুত শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা ধোঁকা ছাড়া কিছুই নয়। সূরা ইসরা (১৭) : ৬৪

অর্থাৎ শয়তান চাইবে সম্পদ ও সন্তানকে বিপথে পরিচালিত করতে। কিন্তু বান্দাকে আল্লাহ তাআলা সে সম্পর্কে আগেই সতর্ক করে দিয়েছেন। অভিভাবকের কর্তব্য পালনের মূল পর্বটা এখানে এসেই আবর্তিত হয়।

শিশুরা যেকোনো জিনিস খুব সহজে ধারণ করতে পারে। তাদের স্মৃতিতে তা যেন খোদাই হয়ে যায়। গুণীজনেরা যথার্থই বলেছেন, 'শৈশবের শিক্ষা যেন পাথরে অংকিত নকশা।' সুতরাং সন্তানকে সুসন্তান হিসাবে গড়ে তোলার মূল সময় হচ্ছে শৈশব কাল।

বক্ষমাণ প্রবন্ধে সন্তান লালন-পালনের ক্ষেত্রে তিনটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে :

এক. সন্তানের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করা

পিতা-মাতার দুআ আল্লাহ তাআলা কবুল করেন। হাদীস শরীফের ইরশাদ

ثلاثُ دعواتٍ مستجاباتٌ لا شكّ فيهن: دعوة الوالد، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم.

তিন ব্যক্তির দুআ কবুল হয়, এতে কোনো সন্দেহ নেই। পিতা(-মাতা)র দুআ, মুসাফিরের দুআ ও মজলুমের দুআ। সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১৫৩৬; জামে তিরমিযী, হাদীস ১৯০৫; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১০১৯৬

সন্তান মানুষ হওয়ার ক্ষেত্রে মা-বাবার দুআর বড় ভূমিকা রয়েছে। এজন্য নবীগণ তাদের সন্তানদের জন্য দুআ করতেন। কুরআন মাজীদে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের একাধিক দুআর বিবরণ এসেছে। যেমন

وَ اِذْ قَالَ اِبْرٰهِیْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا وَّ اجْنُبْنِیْ وَ بَنِیَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَام.

এবং সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম (আল্লাহ তাআলার কাছে দু‘আ করেছিল আর তাতে) বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক! এ নগরকে শান্তিপূর্ণ বানিয়ে দিন এবং আমাকে ও আমার পুত্রগণকে মূর্তিপূজা থেকে দূরে রাখুন। Ñসূরা ইবরাহীম (১৪) : ৩৫

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আরো দুআ করেন

رَبِّ اجْعَلْنِیْ مُقِیْمَ الصَّلٰوۃِ وَ مِنْ ذُرِّیَّتِیْ، رَبَّنَا وَ تَقَبَّلْ دُعَآء.

হে আমার প্রতিপালক! আমাকেও নামায কায়েমকারী বানিয়ে দিন এবং আমার আওলাদের মধ্য হতেও (এমন লোক সৃষ্টি করুন, যারা নামায কায়েম করবে)। হে আমার প্রতিপালক! এবং আমার দু‘আ কবুল করে নিন।সূরা ইবরাহীম (১৪) : ৪০

মারইয়াম রা. ভূমিষ্ঠ হলে তার ও তার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য তার মা দুআ করেছিলেন

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ ... وَ اِنِّیْ سَمَّیْتُهَا مَرْیَمَ، وَ اِنِّیْۤ اُعِیْذُهَا بِكَ وَ ذُرِّیَّتَهَا مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ.

অতঃপর যখন তার কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করল তখন সে বলল,... আমি তার নাম রাখলাম মারইয়াম এবং তাকে ও তার বংশধরগণকে অভিশপ্ত শয়তান থেকে হেফাজতের জন্য তোমার আশ্রয়ে অর্পণ করলাম। সূরা আলে ইমরান (৩) : ৩৬

সন্তানের ব্যক্তিত্ব গঠনের জন্য পিতা-মাতা আল্লাহর কাছে দুআ-রোনাযারি করবে সন্তানের জন্মের আগ থেকেই, সন্তান কামনার সময় থেকেই। ইয়াহইয়া আলাইহিস সালামের জন্মের পূর্বে হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালাম তাঁর জন্য দুআ করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা ফরমান

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِیَّا رَبَّهٗ، قَالَ رَبِّ هَبْ لِیْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّیَّةً طَیِّبَةً، اِنَّكَ سَمِیْعُ الدُّعَآء.

এ সময় যাকারিয়া স্বীয় প্রতিপালকের কাছে দু‘আ করল। বলতে লাগল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তোমার নিকট হতে পবিত্র সন্তান দান কর। নিশ্চয়ই তুমি দুআ শ্রবণকারী। Ñসূরা আলে ইমরান (৩) : ৩৮

তিনি আরো দুআ করেনÑ হে প্রভু! আপনি আমাকে একটি সন্তান দান করুন। এবং (বলেন)

وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا.

হে রব! তাকে এমন বানান, যে (আপনার) সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত হবে। Ñসূরা মারইয়াম (১৯) : ৬

অর্থাৎ সন্তান ভূমিষ্ঠের পূর্বেই তিনি নেক সন্তান কামনা করে দুআ করেছেন।

হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামের ভূমিষ্ঠের পূর্বে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম দুআ করেছিলেন

رَبِّ هَبۡ لِیۡ مِنَ الصّٰلِحِیۡنِ.

হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এমন পুত্র দান কর,যে হবে সৎলোকদের একজন।সূরা আসসাফ্‌ফাত (৩৭) : ১০০

হযরত মারইয়াম রা.-এর জন্মের পূর্বে তার মা দুআ করেছিলেন

رَبِّ اِنِّیۡ نَذَرۡتُ لَکَ مَا فِیۡ بَطۡنِیۡ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلۡ مِنِّیۡ، اِنَّکَ اَنۡتَ السَّمِیۡعُ الۡعَلِیۡمُ.

হে আমার প্রতিপালক! আমার গর্ভে যে শিশু আছে, তাকে সকল কাজ থেকে মুক্ত রেখে তোমার জন্য উৎসর্গ করলাম। সুতরাং তুমি আমার পক্ষ হতে তা কবুল কর। নিশ্চয়ই তুমি (সকল কিছু) শোন ও (সকল বিষয়ে) জান। সূরা আলে ইমরান (৩) : ৩৫

সন্তানের জন্য নেক দুআ করা নেককার মুমিনের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তাআলা তাঁর খাছ বান্দাদের একটি গুণ বর্ণনা করেছেন যে, তারা বলে

رَبَّنَا هَبۡ لَنَا مِنۡ اَزۡوَاجِنَا وَ ذُرِّیّٰتِنَا قُرَّۃَ اَعۡیُنٍ وَّ اجۡعَلۡنَا لِلۡمُتَّقِیۡنَ اِمَامًا.

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান কর, যারা হবে আমাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর এবং আমাদেরকে কর মুত্তাকীদের জন্য অনুসরণযোগ্য। সূরা ফুরকান (২৫) : ৭৪

সুতরাং সন্তানের জন্য বেশি বেশি নেক দুআ করতে থাকা। তাদের উত্তম শিক্ষা-দীক্ষার জন্য আল্লাহর সাহায্য চাওয়া। কেননা তিনিই উত্তম সাহায্যকারী। আল্লাহর কাছে চাইতে থাকলে আল্লাহ অবশ্যই কবুল করবেন।

দুই. শিশুর কানে তাওহীদ ও রিসালাতের বাণী পৌঁছাতে থাকা

জন্মের পর থেকে নবজাতকের কানে এমন সব শব্দবাক্য বলতে থাকা, যা শিশুর হৃদয়ে আল্লাহ ও রাসূলের মহব্বত পয়দা করবে এবং দ্বীন-ধর্মের ভালবাসা সৃষ্টি করবে। এজন্যই সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তার কানে আযান দেয়া হয়।

আবু রাফে রা. বলেন

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি ফাতেমা রা.-এর পুত্র হাসান ইবনে আলীর জন্ম হলে তার কানে আযান দিয়েছেন। Ñসুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৫১০৫, জামে তিরমিযী, হাদীস ১৫৯৪

আযানের মধ্যে কী আছে? আযানের প্রথম চারটি বাক্যে আছে আল্লাহর বড়ত্বের ঘোষণা, পরের দুটি বাক্যে আল্লাহর একত্ববাদ ও শিরকমুক্ত হওয়ার সাক্ষ্য, এর পরের দুটি বাক্যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী এবং তাঁর আদর্শকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করার স্বীকারোক্তি, তার পরের দুটি বাক্যে রয়েছে নামায তথা আল্লাহর ইবাদতের প্রতি দাওয়াত। পরবর্তী দুটি বাক্যে রয়েছে সফলতার প্রতি আহ্বান। সর্বশেষে পুনরায় আল্লাহর একত্ববাদ ও নবীজীর রিসালাতের ঘোষণা।

সুতরাং অভিভাবকের কর্তব্য, শিশুর কানে সুযোগে সুযোগে এমন শব্দ-বাক্য দেওয়া, যা শিশুর হৃদয়ে আল্লাহ তাআলার তাওহীদ জাগ্রত রাখবে, তাঁর প্রতি মহব্বত-ভালবাসা বৃদ্ধি করবে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাত ও আদর্শের প্রতি অনুপ্রাণিত করবে এবং আখেরাতের কামিয়াবির জন্য তার মন-মানসিতাকে প্রস্তুত করবে।

সালাফে সালেহীন তথা মহান পূর্বসূরীগণ তাঁদের সন্তানদেরকে ছোট বেলায় দ্বীনের মৌলিক অনেক বিষয় শিখিয়ে দিতেন। তাঁদের একটা নীতি ছিল

كانوا يستحبون أن يُلَقِّنُوْا الصبي يُعْرِبُ أولَ ما يتكلم يقول : لا إله إلا الله سبع مرات، ويكون ذلك أول شيء يتكلم به.

সাহাবী ও তাবেয়ীগণ শিশু স্পষ্ট উচ্চারণে কথা বলতে সক্ষম হলে তার কানের নিকট সাতবার لا إله إلا الله পড়তেন। ফলে শিশু সর্বপ্রথম যা উচ্চারণ করত তা হল لا إله إلا الله । Ñমুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, বর্ণনা ৩৫১৯; মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক, বর্ণনা ৭৯৬৭

মোটকথা, প্রিয় সন্তান যেন মানুষ হিসাবে গড়ে উঠতে পারে সেজন্য শিশুকাল থেকেই মেহনত করতে হবে। তাকে আল্লাহর গুণাবলির কথা, তাঁর একত্ববাদের কথা, নবীগণের ঘটনাবলি, সাহাবায়ে কেরাম ও অন্যান্য নেককার বান্দাদের কর্ম ও বাণি শোনাতে হবে।

তিন. সন্তানকে ভালো ও সুন্দর উপদেশ দেওয়া

সুন্দর উপদেশ কী ? এখানে আমরা এর দু'টি নমুনা পেশ করছি

ক. হযরত লুকমান হাকীম-এর নাম কে না জানে! তিনি ছিলেন কুশ্রী, নাক চেপটা, ঠোঁট মোটা, হাবাশীদের চেয়েও কালো। ছিলেন কাঠমিস্ত্রি এবং এক ব্যক্তির গোলাম। Ñতাফসীরে ইবনে কাসীর ৩/৭০৫-৭০৬

লুকমান রা.-এর যবান থেকে সবসময় প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণী উৎসারিত হত। এজন্য তিনি হাকীম তথা প্রজ্ঞাবান অভিধায় ভূষিত হন।

তিনি ছিলেন নেককার বান্দা, আল্লাহর ওলী। তাঁর হেকমতপূর্ণ কথাগুলো আল্লাহর খুব পছন্দ। তিনি নিজ সন্তানকে উদ্দেশ্য করে কিছু উপদেশ দিয়েছিলেন। আল্লাহ তাআলার নিকট তা এত পছন্দ

হয় যে, তিনি কুরআনে কারীমে তা উল্লেখ করে তার বাণীকে চির অমর করেছেন। যুগে যুগে যা সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার উত্তম উপদেশের উত্তম নমুনা হয়ে থাকবে। কুরআন মাজীদে সূরা লুকমানের ১৩ থেকে ১৯ আয়াত পর্যন্ত এর বিবরণ এসেছে। উপদেশগুলো হচ্ছে :

১. সন্তানকে তাওহীদ ও একত্ববাদ তথা আল্লাহ এক, তাঁর কোনো শরীক নেই এই কথার শিক্ষা দেওয়া। এটি ছিল সন্তানের প্রতি লুকমান হাকীমের প্রথম উপদেশ

وَ اِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَ هُوَ يَعِظُهٗ : يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللهِ، اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْم.

এবং (সেই সময়কে) স্মরণ কর, যখন লুকমান তার পুত্রকে উপদেশচ্ছলে বলেছিল, হে বাছা! আল্লাহর সাথে শিরক করো না। নিশ্চয়ই শিরক চরম জুলুম। Ñসূরা লুকমান (৩১) : ১৩

২. ইয়াকীন ও বিশ্বাসের উপদেশ। বান্দা যেখানেই থাকে আল্লাহ তাআলা তাকে দেখেন, তার সম্পর্কে সবকিছু জানেন সন্তানের হৃদয়ে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল করে দেওয়া।

يٰبُنَيَّ اِنَّهَاۤ اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ اَوْ فِی السَّمٰوٰتِ اَوْ فِی الْاَرْضِ يَاْتِ بِهَا اللهُ، اِنَّ اللهَ لَطِيْفٌ خَبِيْر.

হে বাছা! কোনো কিছু যদি সরিষার দানা বরাবরও হয় এবং তা থাকে কোনও পাথরের ভেতর কিংবা আকাশমণ্ডলীতে বা ভূমিতে, তবুও আল্লাহ (কিয়ামতের দিন) তা উপস্থিত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি সূক্ষ্মদর্শী, সবকিছুর খবর রাখেন। সূরা লুকমান (৩১) : ১৬

৩. আল্লাহর আনুগত্যের উপদেশ। নিজে আল্লাহর ফরমাবরদারি করা ও নাফরমানি থেকে বেঁচে থাকা এবং অন্যকেও সে পথে আনার প্রচেষ্টা করা। এ পথে কষ্ট ও বিপদ-আপদের সম্মুখীন হলে সবর করা।

يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَ اْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ اصْبِرْ عَلٰى مَاۤ اَصَابَكَ، اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْر.

বাছা! নামায কায়েম কর, মানুষকে সৎকাজের আদেশ কর, মন্দ কাজে বাধা দাও এবং তোমার যে কষ্ট দেখা দেয়, তাতে সবর কর। নিশ্চয়ই এটা অত্যন্ত হিম্মতের কাজ। সূরা লুকমান (৩১) ১৭

৪. আত্মশুদ্ধি, বিশেষকরে অহংকার থেকে কলবকে পরিষ্কার রাখার প্রতি সন্তানের মনোযোগ আকর্ষণ করা।

وَ لَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَ لَا تَمْشِ فِی الْاَرْضِ مَرَحًا، اِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْر.

এবং মানুষের সামনে (অহংকারে) নিজ গাল ফুলিও না এবং ভূমিতে দর্পভরে চলো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো দর্পিত অহংকারীকে পছন্দ করেন না।সূরা লুকমান (৩১) : ১৮

৫. সন্তানকে উত্তম আখলাকে দিক্ষীত করা।

.وَ اقْصِدْ فِیْ مَشْیِكَ وَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِیْرِ

নিজ পদচারণায় মধ্যপন্থা অবলম্বন কর এবং নিজ কণ্ঠস্বর সংযত রাখ। নিশ্চয়ই সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট স্বর গাধাদেরই স্বর। সূরা লুকমান (৩১) : ১৯

লুকমান হাকীম তাঁর সন্তানকে যেসব উপদেশ দিয়েছেন এর শব্দে শব্দে নিহিত রয়েছে গভীর মর্ম।

খ. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সীরাতে রয়েছে আদর্শ শিশু গঠনের উত্তম নির্দেশনা। নবীজী শিশু ইবনে আব্বাসকে যে নসীহত করেছিলেন তা বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে।

একদিন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনে আব্বাস রা.-কে ডেকে সওয়ারীতে নিজের পিছনে বসালেন। এরপর তার পিঠে হাত রাখলেন এবং বললেন

!يا غلامُ! ألا أعلمك كلماتٍ ينفعُك الله بهن

প্রিয় বৎস! আমি কি তোমাকে এমন কিছু কথা শিখিয়ে দিব, যেগুলো দ্বারা আল্লাহ তোমাকে উপকৃত করবেন?

এরপর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিশু ইবনে আব্বাসকে কিছু গুরত্বপূর্ণ নসীহত পেশ করেছেন। ইবনে আব্বাস রা. বড় হওয়ার পর সেগুলো অন্যদের নিকট বর্ণনা করেছেন।

১. আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করা।

.احفظ الله يحفظْك، احفظ الله تجده أمامك

তুমি আল্লাহকে হেফাযত করো, আল্লাহ তোমাকে হেফাযত করবেন। তুমি আল্লাহকে হেফাযত করো, আল্লাহকে তোমার সম্মুখে পাবে। জামে তিরমিযী, হাদীস ২৫১৬; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২৬৬৯

অর্থাৎ তুমি আল্লাহ তাআলার আদেশ-নিষেধ মেনে চলো, তাঁর সন্তুষ্টি হাছিলে সচেষ্ট হও, বিপদ-আপদে তিনি তোমার পাশে থাকবেন, তোমাকে সাহায্য করবেন।

২. আল্লাহ তাআলার পরিচয় ও মহব্বত লাভ করা।

.تعرّف إليه في الرّخاء يعرِفْك في الشدة

সুখের সময় আল্লাহকে চেন, (তাঁর কথা স্মরণে রাখো) দুঃখের সময় তিনি তোমাকে চিনবেন। Ñমুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২৮০৩; আলআহাদীসুল মুখতারা ১০/২৪

অর্থাৎ সুখ ও আনন্দের সয়ম আল্লাহ তাআলার ইবাদত-উপাসনা করে তাঁর মহব্বত ও পরিচয় অর্জন করো, দুঃখ ও মসিবতের সময় তিনি তোমাকে সাহায্য করবেন।

৩. আল্লাহর কাছে চাওয়া এবং একমাত্র তাঁর উপর ভরসা করা।

إذا سألتَ فاسأل الله، وإذا استعنتَ فاستعِن بالله.

যখন চাইবে আল্লাহর কাছে চাইবে। আর যখন সাহায্য চাইবে আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইবে। Ñজামে তিরমিযী, হাদীস ২৫১৬; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২৬৬৯

অর্থাৎ কম-বেশি, ছোট-বড় যত কিছু তোমার প্রয়োজন হয়, সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার শরণাপন্ন হবে। তাঁর কাছেই চাইবে।

৪. আল্লাহ ছাড়া কারো উপকার বা অপকার করার ক্ষমতা নেই।

واعلم أن الأمة لو اجْتَمَعَت على أن يَنْفَعُوْك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كَتَبَه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يَضُرّوك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك

জেনে রেখো, জগতের সকল মানুষ মিলে যদি তোমার কোনো উপকার করতে চায়, তবে ততটুকুই পারবে যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য লিখে রেখেছেন। পৃথিবীর সবাই একত্র হয়ে যদি তোমার কোনো ক্ষতি করতে চায় তবে এর চেয়ে বেশি পারবে না, যা আল্লাহ তাআলা তোমার জন্য লিখে রেখেছেন।প্রাগুক্ত

৫. তাকদীর ও আল্লাহর ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকা।

رُفعت الأقلام وجَفّت الصحُف.

(তাকদীর লেখার) কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং সহীফা শুকিয়ে গেছে। (এতে আর রদবদল হবে না।) প্রাগুক্ত

অর্থাৎ তোমার জীবনে ভালো ও মন্দ, আনন্দ ও বেদনার যত অবস্থা আসবে সব লেখা হয়ে গেছে এবং সে লেখা চূড়ান্ত করে ফেলা হয়েছে। এতে আর কোনো পরিবর্তন হবে না। সুতরাং সুখ ও দুঃখ সব হালতেই তুমি আল্লাহর ফায়সালার উপর রাজি থাকো।

واعلم أن ما أَصابك لم يكُنْ ليُخْطِئَك، وأن ما أَخْطأَك لم يكن ليُصِيْبَك.

স্বারণ রেখো, তোমার কাছে (ভালো বা মন্দ) যা এসেছে তা তোমার থেকে দূর হওয়ার ছিল না এবং যা তোমার থেকে ছুটে গেছে তা তোমার নিকট আসার ছিল না। Ñমুসনাদে আব্দ ইবনে হুমায়দ, হাদীস ৬৩৬; আলআদাব, বায়হাকী, হাদীস ৭৫৮

৬. দুনিয়া পরীক্ষার জায়গা। বিভিন্ন সময় বান্দা বিভিন্ন অবস্থার সম্মুখীন হয়। তখন সবর করা।

واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرَج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.

জেনে রেখো, অপ্রীতিকর অবস্থায় ধৈর্যধারণে প্রভূত কল্যাণ নিহিত আছে। নিশ্চয় সবর করলে সাহায্য আসে, কষ্টের পর আরাম আসে এবং সংকটের পর প্রশস্ততা আসে।মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২৮০৩; আলআহাদীসুল মুখতারা ১০/২৪

লক্ষ করুন, একেকটা নসীহত কত মূল্যবান! একটি শিশুর হৃদয়ে যদি এ উপদেশমালা গেঁথে যায় জীবনের সফলতার জন্য আর কী চাই! প্রতিটি নসীহতই আলোকবর্তিকা। এভাবেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিক্ষক শিশু ইবনে আব্বাসের ঈমানী মানস গঠন করেছেন।

নবীজীর নসীহতের পূর্বাপর লক্ষ করলে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় সামনে আসবে। তা হলঁ শিশুর সামনে নসীহত পেশ করার আগে সে যেন আগ্রহের সাথে তা কবুল করে সে অবস্থা ও মানসিকতা তৈরি করা। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হঠাৎ করে শিশু ইবনে আব্বাসকে নসীহত শোনাতে আরম্ভ করেননি। এর আগে ইবনে আব্বাস রা.-কে মানসিকভাবে প্রস্তুত করেছেন।

তিনি তাকে নিজ সওয়ারীতে উঠিয়েছেন। নিজের সাথে বসিয়েছেন। এতে শিশু ইবনে আব্বাসের মন ভরে উঠেছে। নবীজীর প্রতি একটা টান তৈরি হয়েছে। তারপর তার পিঠে স্নেহের হাত বুলিয়ে দিয়েছেন। এরপর ‘ইয়া গোলাম’ বলে আদুরে সম্বোধন করেছেন। তারপর উপদেশ পেশ করার আগেই সেগুলোর লাভ শুনিয়ে দেওয়া, উপদেশের প্রতি আগ্রহি করে তুলেছেন ‘এগুলো দ্বারা তোমার অনেক উপকার হবে।’ এসবের পর যখন ইবনে আব্বাস রা.-এর মনে পুরোপুরি আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে তখন একটা একটা করে সবক’টি নসীহত পেশ করেছেন।

দ্বিতীয় যে বিষয়টি বিশেষ চিন্তার দাবি রাখে তা হল শিশুকে ভালো কাজের অনুপ্রেরণা প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে সে কাজের লাভের বিবরণ দেওয়া। যাতে নিজ আগ্রহে সে কাজটি করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনে আব্বাস রা.-কে শুধু আল্লাহর আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত হননি, সাথে সাথে এর লাভ বলেছেন যে, এতে করে আল্লাহ তোমার সঙ্গে থাকবেন, তোমার সাহায্য করবেন।

তদ্রুপ শিশুকে মন্দ কাজ থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দেওয়ার সাথে সাথে এ কাজের ক্ষতির দিকটাও আলোচনা করা। এতে করে শিশুর মনে মন্দ স্বভাবের প্রতি ঘৃণাবোধ জাগ্রত হবে।

লুকমান হাকীমের হেকমতপূর্ণ উপদেশগুলো আবার একটু লক্ষ করুন যে কয়টি কাজ থেকে তিনি সন্তানকে বিরত রাখতে চেয়েছেন, প্রত্যেকটির সাথে ঐ আচরণের মন্দ দিকেরও বর্ণনা দিয়েছেন।

শিরক সম্পর্কে বলেছেন নিশ্চয়ই শিরক চরম জুলুম। অহংকারের ব্যাপারে বলেছেন নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনও দর্পিত অহংকারীকে পছন্দ করেন না। উঁচু কর্কশ আওয়াজের ব্যাপারে বলেছেন নিশ্চয়ই সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট স্বর হচ্ছে গাধার স্বর।

সুতরাং আমরা শিশুদের প্রতি শুধু ভালো কাজের নির্দেশ এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করেই থেমে যাব না; বরং এর সাথে ভালোর লাভ ও মন্দের ক্ষতির কিছু কিছু দিকও তার সামনে তুলে ধরব। আল্লাহ তাআলাই উত্তম তাওফীক দানকারী।

শিশুর মধ্যে উন্নত গুণাবলির বিকাশ ঘটানোর সহজ ও সুন্দর পদ্ধতি

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নসীহতগুলোর দিকে গভীর দৃষ্টি দিলে বোঝা যায়, শিশুর জীবন গঠনের জন্য তিনি যে বিষয়টির প্রতি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বারোপ করেছেন তা হল আল্লাহর সাথে শিশুর সম্পর্ক কায়েম করে দেওয়া। শিশুর জীবন সরল পথে পরিচালিত হওয়ার জন্য এর চেয়ে সহজ ও সুন্দর পদ্ধতি আর কী হতে পারে!

শিশুকে বিভিন্ন উপলক্ষে আল্লাহ তাআলার কথা স্মরণ করিয়ে দিন। সুস্বাদু ফল খাওয়ার পর বলুন, আব্বু! দেখেছ, আল্লাহ আমাদের জন্য কী মিষ্টি ফল সৃষ্টি করেছেন! মজাদার খাবার গ্রহণের পর বলুন, বাবা! আমরা যদি নামায পড়ি, কুরআন শিখি, আল্লাহর হুকুম মেনে চলি তাহলে আল্লাহ তাআলা জান্নাতে আমাদেরকে এর চাইতেও বেশি মজাদার খাবার দান করবেন।

শিশুর মাঝে সৎ স্বভাব জাগ্রত করতে তাকে বলুন সত্য কথা বল, আল্লাহ খুশি হবেন। মানুষের খেদমত কর, আল্লাহ খুশি হয়ে জান্নাত দান করবেন।

মন্দ স্বভাব থেকে পবিত্র করার ক্ষেত্রে বলতে পারেন মিথ্যা বল না, কারণ আল্লাহ মিথ্যুককে পছন্দ করেন না। ঝগড়া-বিবাদ কোরো না, তাহলে আল্লাহ নারায হবেন।

সন্তান কোনো ভালো কাজ করলে, তাকে বলুন, মাশাআল্লাহ, তুমি একটা ভালো কাজ করেছ। আল্লাহ তোমার প্রতি অনেক খুশি হয়েছেন; যারা ভালো কাজ করে আল্লাহ তাদের খুব ভালবাসেন। কোনো মন্দ কিছু করলে বলতে পারেন না, এমন আর করবে না, এতে আল্লাহ তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন।

এভাবে তার মনে আল্লাহর প্রতি ভয় ও ভালবাসা সৃষ্টির চেষ্টা করুন। তাহলে আশা করা যায়, সন্তান সাচ্চা মুমিন ও ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে উঠবে, ইনশাআল্লাহ। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের সন্তানদের আপনার প্রিয় বান্দা হিসেবে কবুল করুন। তাদের প্রতি আমাদের কর্তব্য পালনের তাওফীক দান করুন আমীন।

সন্তান লালন-পালন

আল্লাহ তা'আলা মানব জীবনকে সন্তান-সন্তুতির মাধ্যমে ভারসাম্যপূর্ণ এবং আকর্ষণীয় করেছেন। পারিবারিক জীবনে সন্তান-সন্ততি কতবড় নিয়ামত তা যার সন্তান হয়নি তিনি সবচেয়ে বেশি উপলব্ধি করে থাকেন। যাদেরকে আল্লাহ রাববুল আলামীন সন্তান দান করেছেন তাদের উপর এক মহান দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। পিতা-মাতার জন্য সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা হবে যদি সন্তানকে আদর্শবান রূপে গড়ে না তুলতে পারেন। কেননা আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদিসে এসেছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "প্রতিটি নবজাতক তার স্বভাবজাত দ্বীন ইসলামের ওপর জন্ম গ্রহণ করে। অতঃপর তার মা-বাবা তাকে ইয়াহূদী, নাসারা অথবা অগ্নিপূজক হিসেবে গড়ে তোলে।" [সহীহ বুখারী: ১৩৫৮]

আমাদের সমাজ ব্যবস্থা দিন দিন যেভাবে অপসংস্কৃতি, অনৈতিকতা এবং চরিত্র বিধ্বংসী কাজের দিকে ধাবিত হচ্ছে, সেখানে আমাদের সন্তানের উপর যেসব দায়িত্ব আছে তা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পালন করতে হবে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশিত পন্থায় সন্তানকে লালন-পালন করা ঈমানের অন্যতম দাবী। আমাদের উপর সন্তানদের যে হকগুলো রয়েছে তা এখানে আলোচনা করা হলো :

(১) কানে আযান দেয়া: সন্তান দুনিয়াতে আসার পর গোসল দিয়ে পরিষ্কার করে তার ডান কানে আযান দেয়া, তা ছেলে হোক বা মেয়ে হোক। এটি পিতা-মাতার উপর এজন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বযে, শিশুর কানে সর্বপ্রথম আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের আওয়াজ পৌঁছে দেয়া এবং ওত পেতে থাকা শয়তান যাতে তার কোন ক্ষতি না করতে পারে। হাদিসে এসেছে, আবূ রাফে রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "আমি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাসান ইবনে আলীর কানে আযান দিতে দেখেছি।" [সুনান আবূ দাউদ:৫১০৫]

(২) সুন্দর নাম রাখা: "বাচ্চার জন্য সুন্দর নাম নির্বাচন করা পিতা-মাতার অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য। নাম অর্থবহ হওয়া নামের সৌন্দর্য। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক অসুন্দর নাম পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন।" [আবু দাউদ ৪৯৫২-৪৯৬১]

(৩) আক্বিকা করা : ইসলামী সংস্কৃতির অন্যতম বিষয় হলো সন্তানের আকীকা করা। ছেলের পক্ষ থেকে ২টি ছাগল এবং মেয়ের পক্ষ থেকে ১টি ছাগল আল্লাহর নামে যবেহ করা। হাদীসে এসেছে, সামুরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "সকল নবজাতক তার আক্বিকার সাথে আবদ্ধ। জন্মের সপ্তম দিন তার পক্ষ থেকে জবেহ করা হবে। ঐ দিন তার নাম রাখা হবে। আর তার মাথার চুল কামানো হবে।" [সুনান আবূ দাউদ: ২৮৩৮]

(৪) **সদকাহ করা:** ছেলে হোক বা মেয়ে হোক সপ্তম দিবসে চুল কাটা এবং চুল পরিমাণ রৌপ্য সদকাহ করা সুন্নাত। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত: "রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান রা. এর পক্ষ থেকে ১টি বকরী আকীকা দিয়েছেন এবং বলেছেন, হে ফাতেমা ! তার মাথা মুণ্ডন কর এবং চুল পরিমাণ রৌপ্য সদকাহ কর।" [সুনান আত-তিরমিযী: ১৫১৯] এছাড়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "শিশুদেরকে খেজুর দিয়ে তাহনীক এবং বরকতের জন্য দো'আ করতেন।" [সহীহ বুখারী: ৩৯০৯; মুসলিম: ২১৪৬]

(৫) **খাতনা করা:** ছেলেদের খাতনা করানো একটি অন্যতম সুন্নাত। হাদীসে এসেছে: "জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান এবং হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমার সপ্তম দিবসে আকীকা এবং খাতনা করিয়েছেন।" [আল-মু'জামুল আওসাত: ৬৭০৮]

(৬) **তাওহীদ শিক্ষা দেয়া:** শিশু যখন কথা বলা আরম্ভ করবে তখন থেকেই আল্লাহর তাওহীদ শিক্ষা দতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে লক্ষ্য করে বলেন: "হে বৎস! আমি তোমাকে কয়েকটি বাক্য শিখাতে চাই। তুমি আল্লাহর অধিকারের হেফাযত করবে, আল্লাহও তোমার হেফাযত করবেন। তুমি আল্লাহর অধিকারের হেফাযত করবে, তুমি তাঁকে সর্বদা সামনে পাবে। যখন কোন কিছু চাইবে তখন আল্লাহর কাছেই চাইবে। আর যখন সহযোগিতা চাইবে তখন আল্লাহর কাছেই চাইবে। আর জেনে রাখ! যদি পুরো জাতি যদি তোমার কোন উপকার করার জন্য একতাবদ্ধ হয়, তবে তোমার কোন উপকার করতে সমর্থ হবে না, শুধু ততটুকুই করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য লিখে রেখেছেন। আর যদি পুরো জাতি যদি তোমার কোন ক্ষতি করার জন্য একতাবদ্ধ হয়, তবে তোমার কোন ক্ষতি করতে সমর্থ হবে না, শুধু ততটুকুই করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য লিখে রেখেছেন। কলমের লিখা শেষ হয়েছে এবং কাগজসমূহ শুকিয়ে গেছে।" [তিরমিযী: ২৫১৬]

(৭) **কুরআন শিক্ষা দান:** ছোট বেলা থেকেই সন্তানকে কুরআন শিক্ষা দিতে হবে। কেননা কুরআন শিক্ষা করা ফরয। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "তোমরা তোমাদের সন্তানদের তিনটি বিষয় শিক্ষা দাও। তন্মধ্যে রয়েছে তাদেরকে কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা ও কুরআনের জ্ঞান দাও।" [জামিউল কাবীর]

কুরআন শিক্ষা দেয়ার চেয়ে উত্তম কাজ আর নেই। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ''তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সেই যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে ও অপরকে শিক্ষা দেয়।'' [সহীহ বুখারী:৫০২৭]

(৮) **সলাত শিক্ষা দেয়া ও সলাত আদায়ে অভ্যস্ত করা:** এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার যে পিতা-মাতা তার সন্তানকে সলাত শিক্ষা দিবেন এবং সলাত আদায়ে অভ্যস্ত করাবেন। হাদীসে এসেছে: "আমর ইবনে শূয়াইব রাদিয়াল্লাহু আনহু তার বাবা তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা তোমাদের সন্তানদের সলাতের নির্দেশ দাও সাত বছর বয়সে। আর দশ বছর বয়সে সলাতের জন্য মৃদু প্রহার কর এবং শোয়ার স্থানে ভিন্নতা আনো।" [সুনান আবূ দাউদ: ৪৯৫]

(৯) আদব বা শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া: "সন্তানদের আচরণ শিক্ষা দেয়া পিতামাতার উপর দায়িত্ব ও কর্তব্যের অন্তর্ভূক্ত। লুকমান আলাইহিস সালাম তার সন্তানকে বললেন, 'আর তুমি মানুষের দিক থেকে তোমার মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না। আর যমীনে দম্ভভরে চলাফেরা করো না; নিশ্চয় আল্লাহ কোন দাম্ভিক, অহঙ্কারীকে পছন্দ করেন না। আর তোমার চলার ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর, তোমার আওয়াজ নীচু কর; নিশ্চয় সবচাইতে নিকৃষ্ট আওয়াজ হল গাধার আওয়াজ।" [সূরা লুকমান ১৮,১৯]

(১০) আদর স্নেহ ও ভালবাসা দেয়া: সন্তানদেরকে স্নেহ করা এবং তাদেরকে আন্তরিকভাবে ভালবাসতে হবে। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত: "তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে চুম্বন দিলেন এবং আদর করলেন। সে সময় আকরা ইবনে হাবিস রাদিয়াল্লাহু আনহুও উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলতে লাগলেন, আমারতো দশটি সন্তান কিন্তু আমিতো কখনো আমার সন্তানদেরকে আদর স্নেহ করিনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিকে তাকালেন এবং বললেন, যে অন্যের প্রতি রহম করে না আল্লাহও তার প্রতি রহম করেন না।" [সহীহ বুখারী: ৫৯৯৭]

(১১) দ্বীনি ইলম শিক্ষা দেয়া: সন্তানকে দীনি ইলম শিক্ষা দেয়া ফরজ করা হয়েছে। কারণ দ্বীনি ইলম না জানা থাকলে সে বিভ্রান্ত এবং ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভূক্ত হবে। হাদীসে এসেছে: "আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক মুসলিমের উপর জ্ঞানার্জন করা ফরয।" [সুনান ইবন মাজাহ: ২২৪]

(১২) প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া পর্যন্ত লালন-পালন করা: সন্তানদেরকে প্রাপ্ত বয়স্ক পর্যন্ত লালন-পালন করতে হবে এবং তাদের জন্য প্রয়োজনীয় খরচ করতে হবে। "উম্মে সালামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম আবূ সালামার সন্তানদের জন্য আমি যদি খরচ করি এতে কি আমার জন্য প্রতিদান রয়েছে? নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ যতদিন তুমি খরচ করবে ততদিন তোমার জন্য প্রতিদান থাকবে।" [সহীহ বুখারী: ৫৩৬৯]

(১৩) সক্ষম করে তোলা: সন্তানদেরকে এমনভাবে সক্ষম করে গড়ে তোলা,তারা যেন উপার্জন করার মত যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে এভাবে বলেছেন: "তোমাদের সন্তান সন্ততিদেরকে সক্ষম ও সাবলম্বি রেখে যাওয়া, তাদেরকে অভাবী ও মানুষের কাছে হাত পাতা অবস্থায় রেখে যাওয়ার চেয়ে উত্তম।" [সহীহ বুখারী:১২৯৫]

(১৪) **বিবাহ দেয়া:** সুন্নাহ পদ্ধতিতে বিবাহ দেয়া এবং বিবাহর যাবতীয় কাজ সম্পাদন করা এবং উপযুক্ত সময়ে বিবাহর ব্যবস্থা করা। আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে: "নিশ্চয়ই পিতার উপর সন্তানের হকের মধ্যে রয়েছে, সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হলে তাকে বিবাহ দেবে।" [জামিউল কাবীর]

(১৫) **দ্বীনের পথে পরিচালিত করা:** পিতা-মাতার অন্যতম দায়িত্ব হলো সন্তানদেরকে দ্বীনের পথে, কুরআন-সুন্নাহর পথে পরিচালনা করা, দ্বীনের বিধান পালনের ক্ষেত্রে অভ্যস্ত করে তোলা। কুরআনে এসেছে: "বল, 'এটা আমার পথ। আমি জেনে-বুঝে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেই এবং যারা আমার অনুসরণ করেছে তারাও। আর আল্লাহ পবিত্র মহান এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত নই'।" [সূরা ইউসুফ : ১০৮]

সন্তানকে দ্বীনের পথে পরিচালনার মাধ্যমে সওয়াব অর্জন করার এক বিরাট সুযোগ রয়েছে। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন: "তোমার মাধ্যমে একজনও যদি হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়, তবে তা হবে তোমার জন্য লালবর্ণের অতি মূল্যবান উট থেকেও উত্তম।" [সহীহ বুখারী]

(১৬) **সন্তানদের মাঝে ইনসাফ করা:** সন্তানগণ পিতামাতার কাছ থেকে ইনসাফ আশা করে এবং তাদের মাঝে ইনসাফ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিষয়ে বিশেষভাবে সতর্ক করে বলেছেন: "তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং তোমাদের সন্তাদের মাঝে ইনসাফ করো।" [সহীহ বুখারী: ২৫৮৭]

(১৭) **ইসলাম অনুমোদন করে না এমন কাজ থেকে বিরত রাখা:** ইসলাম অনুমোদন করে না এমন কাজ থেকে তাদেরকে বিরত না রাখলে এই সন্তানগনই কিয়ামাতে পিতামাতার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে। কুরআনে এসেছে: "হে ইমানদারগণ! তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারবর্গকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও।" [সূরা আত-তাহরীম-৬]

"আর কাফিররা বলবে, 'হে আমাদের রব, জ্বিন ও মানুষের মধ্যে যারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে তাদেরকে আমাদের দেখিয়ে দিন। আমরা তাদের উভয়কে আমাদের পায়ের নীচে রাখব, যাতে তারা নিকৃষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়।" [সূরা হা-মীম আসসিজদাহ-২৯]

(১৮) **পাপকাজ, অশ্লিলতা, বেহায়াপনা, অপসংস্কৃতি থেকে বিরত রাখা :** সন্তান দুনিয়ার আসার সাথে সাথে শয়তান তার পেছনে লেগে যায় এবং বিভিন্নভাবে, ভিন্ন ভিন্ন রুপে,পোশাক-পরিচ্ছেদের মাধ্যমে, বিভিন্ন ফ্যাশনে, বিভিন্ন ডিজাইনে, বিভিন্ন শিক্ষার নামে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়ার ষড়যন্ত্র করে। তাই পিতা-মাতাকে অবশ্যই এ বিষয়ে সতর্ক ও সজাগ থাকতে হবে। আল্লাহ বলেন: "হে মুমিনগণ, তোমাদের স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের কেউ কেউ তোমাদের দুশমন। অতএব তোমরা তাদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। আর যদি তোমরা মার্জনা কর,

এড়িয়ে যাও এবং মাফ করে দাও তবে নিশ্চয় আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু।” [সূরা তাগাবুন-১৪]

হাদীসে এসেছে, ইবনে আববাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত: “রাসূলে করীম রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষের বেশ ধারণকারী নারী ও নারীর বেশ ধারণকারী পুরুষকে অভিসম্পাত করেছেন।” [সহীহ বুখারী:৫৮৮৫]

আব্দুল্লাহ ইবন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “যে ব্যক্তি অন্য জাতির সাথে সা-দৃশ্যতা রাখবে সে তাদের দলভুক্ত বলে গণ্য হবে।” [সুনান আবূ দাউদ:৪০৩১]

(১৯) দো‘আ করা: আমাদের সন্তানদের জন্য দো‘আ করতে হবে। আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে দো‘আ শিক্ষা দিয়েছেন এভাবে,

আল্লাহর নেক বান্দা তারাই যারা বলে: “হে আমাদের রব, আমাদেরকে এমন স্ত্রী ও সন্তানাদি দান করুন যারা আমাদের চক্ষু শীতল করবে। আর আপনি আমাদেরকে মুত্তাকীদের নেতা বানিয়ে দিন।” [সূরা আলফুরকান-৭৪]

যাকারিয়্যা আলাইহিস সালাম আল্লাহর নিকট দো‘আ করেছিলেন: “হে আমার রব, আমাকে আপনার পক্ষ থেকে উত্তম সন্তান দান করুন। নিশ্চয় আপনি প্রার্থনা শ্রবণকারী।” [সূরা আলে ইমরান ৩৮]

সম্মানিত পিতামাতাবৃন্দ, আমরা কি সন্তানের হকগুলো পালন করতে পেরেছি বা পারছি ? আসুন, আমরা আমাদের সন্তানদেরকে নেকসন্তান হিসাবে গড়ে তুলি। যে সম্পর্কে হাদিসে এসেছে, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “মানুষ মৃত্যুবরণ করলে তার যাবতীয় আমল বন্ধ হয়ে যায়, তবে ৩ টি আমল বন্ধ হয় না-
১.সদকায়ে জারিয়া
২.এমন জ্ঞান-যার দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়
৩. এমন নেক সন্তান- যে তার জন্য দো‘আ করে” [সহিহ মুসলিম:১৬৩১]

আল্লাহ তা‘আলা আমাদের সন্তানদেরকে কবুল করুন, তাদের হকসমূহ যথাযথভাবে পালন করার তাওফীক দিন।

আমীন!

সন্তান গঠনে মায়ের ভূমিকা-১

১। মানসিকভাবে প্রশান্তিতে থাকা:

নিজেকে শান্ত রাখার এটাই সবচেয়ে উত্তম উপায় তা হলো, মহান আল্লাহর হুকুম যা আছে তা হবেই, মহান আল্লাহ কারো সাধ্যের বাইরে দায়িত্ব দেন না। যে সন্তানটিকে আপনার মাধ্যমে এই দুনিয়াতে মহান আল্লাহ পাঠানোর পরিকল্পনা করেছেন, তা ইন শা আল্লাহ সহজ ও সুন্দরভাবে আসবে, তবে সেই জন্য মহান রবের রহমতে থাকার কাজগুলো করার প্রচেষ্টা রাখতে হবে। বিশ্বাস ও নির্ভরতা তাঁর উপর রেখে আপনার করনীয় করে যান।

সবচেয়ে উত্তম কাজ হলো ওয়াক্ত মতো নামাজে ধীর স্থিরতার সাথে দাড়ানো এবং নিজের সমস্যা থাকলে তা মহান আল্লাহর কাছে পেশ করা ও সাহায্য চাওয়া।

বোনেরা, মহান আল্লাহর কাছে পুরু ভরসা করে দৃঢ়তার সাথে এই বিশ্বাস রাখা যে, মহান আল্লাহই আমাকে শান্তি ও সব সমস্যার সুন্দর সমাধান করে দিবেন দোয়া করলে অবশ্যই আল্লাহতা’আলা সেই দোয়া কবুল করবেন। কারন মহান আল্লাহ বান্দার হাত ফিরিয়ে দেন না।

আল্লাহতা’আলা বলেছেন—

“হে নবী,আমার বান্দাহ যদি তোমার নিকট আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে তবে তাদের বলে দাও যে, আমি তাদের অতি নিকটে। আমাকে যে ডাকে আমি তার ডাক শুনি এবং তার উত্তর দিয়ে থাকি। কাজেই আমার আহবানে সাড়া দেয়া এবং আমার প্রতি ঈমান আনা তাদের কর্তব্য।” সূরা আল বাকারা: ১৮৬

তোমাদের কেউ দোয়া করলে দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে করবে। দোয়ায় এরুপ বলবে না যে, হে আল্লাহ! যদি তুমি চাও তবে আমাকে দাও। কেননা আল্লাহকে বাধ্য করার কেউ নেই। সহিহ বুখারী

তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে এসে গেছে এক জ্যোতি এবং একখানি সত্য দিশারী কিতাব, যার মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর সন্তোষকামী লোকদেরকে শান্তি ও নিরাপত্তার পথপ্রদর্শন করেন এবং নিজ ইচ্ছাক্রমে তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোকের দিকে নিয়ে আসেন এবং সরল-সঠিক পথের দিকে পরিচালিত করে। সূরা মায়েদা-১৬

২। সবসময় বেশি ভালো চিন্তা করা—-

একটি ভাল কাজ করার কথা মনে আনলেই সওয়াব পাওয়া যায় আর সেটা বাস্তবে আমল করলেতো আরো বেশী সওয়াব হবে।

৩। কোর’আন শুনা বা নিজে পড়া—

“তুমি যদি আল্লাহর কিতাব থেকে একটি আয়াত শেখ,তবে সেটা তোমার জন্য একশত রাকাত(নফল) নামায পড়ার চেয়ে উত্তম। আর যদি তুমি ইসলামী জ্ঞানের একটি অধ্যায় ও

মানুষকে শিখাও, তবে তা তোমার জন্য এক হাজার রাকাত নফল নামাজ পড়ার চেয়েও উত্তম,চাই তদনুসারে আমল করা হোক বা না হোক.” (ইবনে মাজাহ)

বেশী বেশী অনলাইনেও ইসলামিক লেকচার, তেলাওয়াত শুনতে সময় দেয়া। পরিকল্পিতভাবে বিশেষ কোন আয়াত বা সূরা মুখস্ত করা।

৪। আদর্শ মানুষের জীবনী পড়া—

নবী ও সাহাবাসহ ভালো মানুষদের জীবন ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয়া।

৫। ভাল কথা বলা ও শুনা—

সব সময় সুন্দর কথা শুনা ও বলা, গীবত বা নাটক সিনেমার গল্পে লিপ্ত না হয়ে বাস্তব মুখী গল্প করা। সব সময় পজিটিভ চিন্তা করা। আল্লাহ অবশ্যই ভালো করবেন-আল্লাহই সাহায্যকারী

৬। মেজাজ ঠাণ্ডা রাখা / উত্তেজিত না হওয়া–

কোন ভাবেই উত্তেজিত না হওয়া এবং এ ব্যপারে স্বামী ও পরিবারের অন্যদের সহযোগীতা করা দরকার। রাগ আসলে বুঝতে হবে এটা শয়তান করাচ্ছে , তখন হাদীসের আলোকে আমল করতে হবে।রক্ত চাপ ঠিক রাখার জন্য এটা খুব জরুরী।

৭। পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাবার খাওয়া ও বিশ্রাম নেয়া-

অন্য সময়ের তুলনায় এইসময় বেশী খাবার দরকার। শরীরে শক্তি ও পুষ্টি থাকলে মেজাজও ভালো থাকবে। গর্ভের সন্তানের জন্য বেশী প্রয়োজন। তাই প্রতিটা খাবার নেয়ার সময় আল্লাহতা’আলার কাছে বরকতের দোয়া করে খেলে ভালো হবে। হালাল রুজির খাওয়াটা সবচেয়ে বেশী জরুরী। তাতে অল্প খাবারেও আল্লাহতা’আলা বরকত দিবেন ইনশা’আল্লাহ।

৮। পুরো শরীরে আস্তে আস্তে অলিভ অয়েল মাসাজ করে নিন-

অন্য তেলও অবশ্য মালিশ করা যেতে পারে, তবে অলিভ অয়েলে সন্তান জন্মের পর সাধারণত পেটে আর কোনো দাগ থকে না৷’’ এমনটাই বলেন জার্মান ধাত্রী হাইকে শোয়ার্ৎস৷

৯। গর্ভকালীন হালকা ব্যায়ামঃ

ডাক্তারের পরামর্শক্রমে করা দরকার।

১০। পর্যাপ্ত পরিমানে পানি পান করা-

একজন সুস্থ গর্ভবতীর দিনে কম পক্ষে দেড় থেকে দুই লিটার পানি পান করা উচিত৷ তাই মাঝে মাঝেই অল্প অল্প পানি পান করে নেবেন৷ এতে শরীরটা সারা দিন ঝরঝরে লাগবে ।

১১। নিয়মিত ডাক্তারের চেক আপ করানো।

১২। অন্তরকে সবসময় হিংসা, কুচিন্তা, না সূচক চিন্তামুক্ত রাখা-বর্তমান করনীয়কে প্রাধান্য দেয়া। বিশেষ করে মিডিয়া থেকে খারাপ ও ভয়ঙ্কর জিনিষ দেখা থেকে দূরে থাকা। শরীয়তের বাইরে বাজনা, সিনেমা ইত্যাদি থেকে দূরে থাকা প্রয়োজন।

১৩।নিজের অবস্থানকে তুলে ধরা-

পরিবারের অন্য সদস্যদের বুঝতে দিন কখন আপনার খারাপ লাগে, ভুল যেন বুঝতে না পারে নিজেই নিজের কোন অপ্রত্যাশিত আচরনের কারনে দুঃখিত বলা। এই সময় পরিবারের সবাইকেই সহযোগীতা করা প্রয়োজন।

মহান আল্লাহর কাছে সব সময় দোয়া করা।

তিনি মায়ের পেটে থাকা অবস্থায় যেভাবে ইচ্ছা তোমাদের আকৃতি গঠন করেন।এই প্রবল পরাক্রান্ত মহাজ্ঞানের অধিকারী সত্তা ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। –আল ইমরান ৬

‘‘হে আমার রব ! আমার পেটে এই যে সন্তানটি আছে এটি আমি তোমার জন্য উৎসর্গ করলাম। সুতরাং তুমি আমার নিকট হতে উহা কবুল করে নাও। তুমি সবকিছু শোনো ও জানো।’’ –আল-ইমরান-৩৫

সন্তান গঠনে মায়ের ভূমিকা-২

আদর্শ পরিবেশের মাঝে শিশু বেচেঁ থাকলে

সে আদর্শ মানুষ হতে শেখে।

আদর্শ শিক্ষা সম্বলিত পরিবারের মাঝে শিশু বেচেঁ থাকলে
সে আদর্শ শিক্ষা অর্জন করতে শেখে।

সমালোচনার পরিবেশে শিশু বেচেঁ থাকলে
সে কেবল নিন্দা করতে শেখে।

শত্রুতার মাঝে শিশু বেচেঁ থাকলে
সে কেবল হানাহানি করতে শেখে।

বিদ্রুপের মাঝে শিশু বেচেঁ থাকলে
সে কেবল লাজুক হতে শেখে।

কলংকের মাঝে শিশু বেচেঁ থাকলে
সে কেবল অপরাধবোধ শেখে।

প্রশংসার মাঝে শিশু বেচেঁ থাকলে
সে মূল্যায়ন করতে শেখে।

নিরপেক্ষতার মাঝে শিশু বেচেঁ থাকলে
সে ন্যায়পরায়নতা শেখে।

নিরাপত্তার মাঝে শিশু বেচেঁ থাকলে
সে বিশ্বাসী হতে শেখে।

অনুমোদনের মাঝে শিশু বেচেঁ থাকলে
সে নিজেকে ভালবাসতে শেখে।

স্বীকৃতি আর বন্ধুদের মাঝে শিশু বেচেঁ থাকলে
সে শিশু পৃথিবীতে ভালবাসা খুঁজে পেতে শেখে।

(সংগৃহিত)

দাম্পত্য জীবনে সুখের পুষ্প হলোসন্তান। যে সংসারে সন্তান নেই, সে সংসারে সুখ নেই। সব সময় গোমট একটা অন্ধকার যেন সে সংসারকে আষ্টেপৃষ্ঠে আঁকড়ে রাখে! স্বামী-স্ত্রীর হৃদয়ে কোথায় যেন দুঃখের একটা বীন বেজেই চলে। আলো ঝলমলে জীবনেও হাহাকার, ঘনকালো মেঘ রুপ নিয়ে হঠাৎ হঠাৎ হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে ফেলে। দুঃখের অনল ধিক ধিক করে জ্বলে ওঠে। আর যে সংসারে নবজাতক সন্তানের পূর্বাভাস মেলে, সে সংসারে সুখের পায়রারা নিত্য ডানা ঝাপটায়!

তনুমনে খুশির মৃদু সমীকরণ দোলা দিয়ে যায়। স্বপ্নের পর স্বপ্ন আঁকতে থাকে, হৃদয়ের আরশিতে, আলপনার রং তুলি দিয়ে, আসন্ন অতিথিকে ঘিরে।

সন্তান আগমন করে পৃথিবীতে। সবার মনে আনন্দোরা দোলা দিয়ে যায়। খুশিরা হেসে ওঠে ভোরের রাঙা সূর্যের মতো। ঘুচে যায় সমূহ দুঃখ সংসার-জীবন থেকে। সন্তান বাবা-মায়ের চোখের শীতলতার কারণ হয়। তাইতো আমাদের হৃদয়ের স্পন্দন, প্রিয়তম নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুব-ই চমকপ্রদ উদাহরণ ও অনুপম ভাষায় বলেছেন___

ريح الولد من ريح الجنة

সন্তানের ঘ্রাণ বেহেশতের সুবাস। (আল্লামা সাখাবি, আলমাকাসিদুল হাসানাহ, হাদীস : ৫৩৩)

صغاركم دعاميص الجنة

তোমাদের শিশুরা বেহেশতের পতঙ্গ। (বুখারী, আলআদাবুল মুফরাদ, হাদীস : ১৪৫)

আরও একটি চমৎকার হাদীস নবীজির পবিত্র যবান থেকে বর্ণিত হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

ما ولد في أهل بيت غلام إلا أصبح فيهم عز لم يكن

যে পরিবারে কোনও শিশু জন্মলাভ করে, সমাজে তাদের এমন সম্মান সৃষ্টি হয়, যা আগে ছিলো না। (আল্লামা হায়ছামী, মাযমাউয যাওয়াইদ, হাদীস : ১৩৫০২)।

প্রিয় নবীজির ভাষায় সন্তান হলো, বেহেশতের সুবাস, বেহেশতের পতঙ্গ, এবং সমাজে সম্মানের পাত্র হওয়া। এখন কথা হলো, সন্তান জন্মলাভের পর থেকেই বাবা-মায়ের কাঁধে, বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ থেকে যায়। তন্মমদ্ধে উত্তম একটি কাজ হলো, সন্তানের হৃদয়কে সত্য ও ন্যায়ের এবং শুভ্র ও সুন্দরের আলো দিয়ে সাজানো। ভালো-মন্দ ও সত্য-মিথ্যের ফারাক বুঝিয়ে দেয়া।

সন্তানকে মিষ্টি ভাষায় বোঝানো, বাবা! এ-দিকে আলো রয়েছে, আর ও-দিকে আঁধার রয়েছে। এ-দিকটায় ফুল রয়েছে, আর ও-দিকটায় কাঁটা রয়েছে। কারণ মানব শিশুর হৃদয় হলো উর্বর, কোমল,

শুভ্র-সুন্দর। আপনি তার হৃদয়ে যে চরিত্র ও চিন্তা-চেতনা এঁকে দেবেন, সে সে-ই চরিত্র নিয়ে বেড়ে ওঠবে, এবং সে-ই চিন্তা-চেতনা হৃদয়ে লালন-পালন করবে।

সন্তান লালন-পালনে, বাবার চেয়ে মা-ই বেশি পারেন কাজটিকে সুন্দর ও সুচারুভাবে গোছাতে। কারণ সন্তান জন্মলাভের পর থেকে মায়ের স্পর্শ, মমতা, আদর-আহ্লাদ ও সান্নিধ্য বেশি লাভ করে। তাই "আদর্শ সন্তান প্রতিপালনে মায়ের ভূমিকা"অপরিসীম! অনস্বীকার্য!! একজন মমতাময়ী মা যে ধাঁচে, যে পরিকল্পনায় সন্তানকে গড়ে তুলবেন, সন্তান সে ধাঁচে গড়ে উঠবে। কারণ শিশুর হৃদয় চায় গ্রহণ করতে, অনুকরণ করতে। এই কারণে শিশুরা অনুকরণ প্রিয় হয়।

আপনি যেহেতু মা, তাই আপনি অবশ্যই সন্তানের কল্যাণ কামনা করেন। এক্ষেত্রে মায়েরা যে ভুলটা করেন, তা হলো, অধিক আবেগ তাড়িত হয়ে শরীয়ত গর্হিত কাজ সমূহ করে বসেন। তাই সাবধান! সন্তানের প্রতি আপনার আবেগটা যেন শরীয়তের গন্ডির ভেতরে থাকে। নতুবা আপনি হবেন সন্তান-ধ্বংসের মূল কারণ। তাই সন্তান যখন আধো আধো বুলি আওড়াতে লাগবে, তখন থেকে সন্তানের হৃদয়-ভূমিতে ঈমানের বীজ বপন করা শুরু করে দেবেন। সত্যকে সত্য, মিথ্যেকে মিথ্যে, সুন্দরকে সুন্দর, অসুন্দরকে অসুন্দর, তার শুভ্র ও কোমল হৃদয়ে জল ছাপের মতো, আলতো ভাবে এঁকে দেবেন। দেখবেন, ধীরে ধীরে তার বেড়ে ওঠার সাথে সাথে, বুনিয়াদি ঈমানের বীজও অংকুরিত হবে। পত্র-পল্লবে সুসজ্জিবিত হবে। ডাল-শাখা বিস্তার করবে। ফুলে-ফলে ভরে উঠবে। সন্তান বুঝবান ও প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর, তাকে কোনও অশুভ, অশুভ্র, অসুন্দরের ঝড় হাওয়া ঈমান পথ থেকে টলাতে পারবে না। মিথ্যের মরিচিকা ধোকায় ফেলতে পারবে না। অভিসপ্ত শয়তানের মায়া জালে আটকা পড়ে পথ ভ্রষ্ট হবে না।

আর যদি আপনি ভাবেন ও এখনও ছোটো, ভালো-মন্দ কিই-বা বোঝে। সমস্যা নেই, একটু বড় হোক না, তারপর না হয় শেখানো যাবে। নিজের মতো করে চলুক না আর ক'টা দিন। বড় হলে আপনাতেই ঠিক হয়ে যাবে। উঁহু! এটা আপনার বড্ড ভুল ধারণা। আপনি মা হয়ে সন্তানের ওপর অবিচার করেছেন। সন্তানকে আপনি ধ্বংসের অতল গহ্বরে ঠেলে দিচ্ছেন। এর "কুফল" আপনি যেমন

দুনিয়াতে ভোগ করবেন, তেমন আখেরাতেও। তখন লাঞ্ছনার গ্লানি না সইতে পেরে, না পারবেন মরে যেতে, আর না পারবেন বেঁচে থাকতে।

ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ন একটি চমকপ্রদ কথা বলেছেন। আজও কথাটি দীপ্যমান ইতিহাসের পাতায়! কথাটি হলো, "আপনারা আমাকে একজন আদর্শ মা দিন, আমি আপনাদেরকে একটি আদর্শ জাতি উপহার দেবো"। সত্যি কথাটিতে অনেক নিগুঢ় রহস্য রয়েছে। পৃথিবীর ইতিহাসের পাতায় পাতায় যতজন স্বর্ণমানবের নাম আজও ভাস্বর, তাঁদের অধিকাংশের পেছনে মায়ের ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। তুলনা রহিত। মায়ের সুপরিকল্পিত, নিবিড় পরিচর্যায় তাঁরা আমাদের মাঝে আজও অমর, অম্লান, চির ভাস্বর।

হযরত রাবেয়া বসরী রহ.এতো বড় বুযুর্গ, আবেদা, যাহেদা হয়ে ছিলেন একমাত্র তাঁর মমতাময়ী মায়ের অক্লান্ত পরিচর্যায়। আর তাঁর মা-ও ছিলেন অসাধারণ নেককার ও পবিত্র একজন নারী। তিনি নিরলস চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও নিবিড় পরিচালনা করে কলিজার টুকরো কন্যাকে তিলে তিলে গড়ে তুলেছিলেন। তাই এক সময়ের ছোট্ট মেয়েটি, হয়েছিলেন পৃথিবীময় খ্যাতনামা বুযুর্গ ও মহান আল্লাহ তায়ালার প্রিয় বান্দাদের অন্যতম। তিনি যেমন ছিলেন ভাস্বর, আজও তেমন, কেয়ামত তক থাকবেন ঠিক এমনই চির ভাস্বর।

সন্তানকে তাওহীদের শিক্ষা দিন

একজন মুসলিম হিসেবে আমরা সন্তানকে বুদ্ধি বিকাশের প্রথম প্রহরেই দীন সম্পর্কে ধারণা দিতে ইচ্ছুক থাকি। সন্তান কথা বলা শুরু করতেই আমরা অনেকে আল্লাহ, আব্বু-আম্মু শিক্ষা দেই। কালেমায়ে শাহাদাহ শেখাই। তারপর ক্রমেই তাকে সালাত, সিয়াম ইত্যাদি ইবাদতের সঙ্গে পরিচিত করাই। কিন্তু যে কাজটি আমরা করি না তা হলো সন্তানকে শুধু কালেমা শেখানোই নয়; তাকে তাওহীদ শিক্ষা দেয়া, ঈমানের মোটামুটি বিস্তারিত শিক্ষা দেয়া এবং তাওহীদের সঙ্গে সাংঘর্ষিক দিকগুলো সম্পর্কে ধারণা দেয়া।

তাইতো দেখা যায় আমাদের সন্তানরা বড় হয়েও অবচেতন মনে তাওহীদের শিক্ষা পরিপন্থী কাজ করে বসে। শিরকের গন্ধ মিশ্রিত কথা বলে বসে। শিশুকালের এই ঘাটতি আর সারা জীবন পূরণ হয় না। অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায় পরবর্তীতে তাকে স্মরণ করিয়ে দিলে তিনি এটাকে অপমান হিসেবে দেখেন। এমনকি অনেকে বলেই বসেন, হ্যা, বাপ-দাদার আমল থেকে কি তবে ভুলই করে আসছি!

অথচ সাহাবীদের অবস্থা দেখুন। তাঁরা বুদ্ধির উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই শিশুকে তাওহীদ শেখাতেন। ঈমানের শিক্ষাকে তাঁরা এলেম ও আমলের শিক্ষার ওপর অগ্রাধিকার দিতেন। কারণ, এলেম ও আমলেরও আগে ঈমান। জুনদুব বিন আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَنَحْنُ فِتْيَانٌ حَزَاوِرَةٌ ، فَتَعَلَّمْنَا الإِيمَانَ قَبْلَ أَنْ نَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ ، ثُمَّ تَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ , فَازْدَدْنَا بِهِ إِيمَانًا»

‘আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে থাকতাম। তখন আমরা টগবগে যুবা ছিলাম। সে সময় আমরা ঈমান শিখি আমাদের কুরআন শেখার আগে। এরপর আমরা কুরআন শিখি। এতে করে আমাদের ঈমান বেড়ে যায় বহুগুণে।’ (সহীহ ইবন মাজা : ৬১।)

এ জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে কুরআন শেখানোর আগে ঈমান শিক্ষা দেন। আর ঈমান হলো- হাদীসে যেমন এসেছে : আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ».

‘ঈমানের সত্তরের কিছু বেশি অথবা (বর্ণনাকারীর মতে তিনি বলেছেন) ষাটের কিছু বেশি শাখা রয়েছে। এসবের সর্বোচ্চটি হলো, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা এবং সর্বনিম্নটি হলো পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা। আর লজ্জা ঈমানের একটি অংশ।’ (মুসলিম : ১৬২; মুসনাদ আহমদ : ৯৩৫০।)

প্রিয় পাঠক, আপনি নিশ্চয় দেখে থাকবেন, ছোট্র শিশু যে এখনো ভালো করে কথা বলতেও শেখেনি। যখন সে আজানের বাক্য শুনতে পায়, এর সুরে সুর মিলিয়ে, মুয়াজ্জিনের কণ্ঠের

অনুকরণে সেও তার আওয়াজ লম্বা করে। এমনকি উপস্থিত ব্যক্তিদের অলক্ষ্যে সে প্রায়শই প্রতিবার আজানের সময় সচকিত ও উৎকর্ণ হয়। তারপর সে নিজের থেকেই তাওহীদের কালেমা, তাওহীদের নবীর রেসালাতের সাক্ষ্যের কালেমা আবৃত্তি করতে থাকে।

আমার পাশের বাসার ছয় বছর বয়েসী নার্সারিতে পড়া বাচ্চাটি রোজ আজান দেয়। মসজিদের আজান শুরু হওয়া মাত্র পশ্চিম দিকের বেলকনিতে দাঁড়িয়ে সেও শুরু করে আজান দেয়া। বিস্ময়কর এবং ঈমান জাগানিয়া ব্যাপার হলো, বাচ্চাটির আজান হয় প্রায় নির্ভুল এবং উচ্চারণ ও কণ্ঠস্বর বেশ আকর্ষণীয়। সুতরাং প্রতিটি অভিভাবকেরই উচিত, কুঁড়ি থেকে মুকুলিত হবার আগেই নিজের শিশু সন্তানের যত্ন নেয়া। সুন্দর উচ্চারণে শিশুকে কালেমায়ে তাওহীদ তথা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ শিক্ষা দেয়া। তারপর কালেমার মর্ম ও মাহাত্ম্য শিখিয়ে দেয়া।

সম্মানিত অভিভাবকবৃন্দ, আপনি যদি (‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’) কালেমায়ে তাওহীদের মর্ম উপলব্ধি করতেন, এর মাহাত্ম্য ও মর্যাদা সম্পর্কে অবগত হতেন, তবে নিশ্চয় তা নিজের ভেতর দৃঢভাবে ধারণ করতেন এবং নিজ সন্তানকে এ কালেমা বারবার উচ্চারণ ও আবৃত্তি করার নির্দেশ দিতেন। আহমদ বিন হাম্বল রহ. আব্দুল্লাহ বিন উমর রা. সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ نُوحًا صلى الله عليه وسلم لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ لِابْنِهِ : إِنِّي قَاصٌّ عَلَيْكَ الْوَصِيَّةَ ، آمُرُكَ بِاثْنَتَيْنِ ، وَأَنْهَاكَ عَنِ اثْنَتَيْنِ : آمُرُكَ بِلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، فَإِنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَالأَرَضِينَ السَّبْعَ ، لَوْ وُضِعْنَ فِي كِفَّةٍ وَوُضِعَتْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فِي كِفَّةٍ لَرَجَحَتْ بِهِنَّ ، وَلَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَالأَرَضِينَ السَّبْعَ كُنَّ حَلْقَةً مُبْهَمَةً لَقَصَمَتْهُنَّ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ».

‘নূহ আলাইহিস সালামের যখন মৃত্যু উপস্থিত হলো, তিনি তখন তার পুত্রের উদ্দেশে বললেন, ‘আমি তোমাকে সংক্ষেপে অসিয়ত করছি। তোমাকে দুটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি এবং দুটি বিষয় থেকে নিষেধ করছি। তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছি ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’-এর। কেননা সাত আকাশ আর সাত যমীনকে যদি এক পাল্লায় রাখা হয় আর ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ কে রাখা হয় আরেক পাল্লায় তবে সাত আসমান ও যমীনের চেয়ে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’-র পাল্লাই ভারী হবে। যদি সাত আসমান আর সাত যমীন কোনো হেঁয়ালীপূর্ণ বৃত্ত ধারণ করে তবে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ তা ভেদ করে চলে যাবে। [আল-আদাবুল মুফরাদ : ৫৪৮; মুসনাদ আহমদ : ৬৫৮৩।]

উদ্দেশ্য হলো, সন্তান যখন আধো আধো ভাষায় অস্ফূটকণ্ঠে কথা বলতে শুরু করে, প্রথম যখন তার বাকপ্রতিভার অভিষেক ঘটে, তখন ঈমানের শাখাগুলোর মধ্যে প্রথম ও সর্বোচ্চটি তথা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’-এর মাধ্যমেই তা করার চেষ্টা করা উচিত।

একটি বিদেশি পত্রিকায় আমি একটি কার্টুন দেখেছিলাম। এর ক্যাপশনটি ছিল এমন : নিজ সন্তানের প্রথম বাক্যোচ্চারণ শুনে তার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে গায়ক স্বামী তার স্ত্রীকে বলছেন, দেখ, আমাদের বাবুটি গড না বলে প্রথমেই বলছে ‘রাত’!! একজন কণ্ঠশিল্পীর শিশুর কাছে অবশ্য এমনটি অতি বেশি আশ্চর্যের কিছু নয়। কিন্তু বিপত্তি হলো আজকালের মুসলিম পরিচয়ধারী ভাইদের থেকেও এমন ঘটনা ঘটছে। যারা ইসলামের অনুসরণকে ধর্মান্ধতা (?) ভাবলেও নিজেরাই আবার পশ্চিমাদের অনুকরণ করেন অন্ধভাবে। ইদানীং এমন ঘটনা অহরহই ঘটছে। কেবল একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা যাক :

এক ভদ্রলোক তার নিষ্পাপ শিশুকে নিয়ে পথ চলছেন। বয়স তার অনূর্ধ্ব চার বছর। পথে দেখা হলে তার এক বন্ধু বাচ্চাটিকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কি? বাচ্চাটি একজন পপ গায়কের নামে তার পরিচয় দিল। বন্ধুটি বললেন, বাহ্‌! তুমি কি ওই শিল্পীর মতো গান গাইতে পারো? শিশুর বাবা গর্বিত কণ্ঠে বললেন, হ্যা, অবশ্যই। এমনকি তিনি সন্তানকে গান শুনিয়ে দিতেও নির্দেশ দিলেন। বাবার নির্দেশ পেয়ে শিশুটি গাইতে শুরু করলো। অথচ শিশুটি এখনো অনেক শব্দ উচ্চারণ করতে শেখেনি! ট কে সে বলছিল ত আর কঠিন শব্দগুলো উচ্চারণ করছিল তার কল্পনা মতো।

আশা করি শিক্ষণীয় বিষয়টি বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। হ্যা, বলছিলাম নিজের শিশুটিকে শুরু থেকেই আল্লাহর নাফরমানীতে অভ্যস্ত না করে তাঁর প্রশংসা ও বড়ত্ব সূচক সুন্দর বাক্য উচ্চারণে অভ্যস্ত করা উচিত। আমাদের ভেবে দেখা দরকার নিজ সন্তানকে আমরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছি। কোথায় আমরা আর কোথায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী? কোথায় তাঁদের সন্তান আর কোথায় আমাদের সন্তান?

﴿ فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيَهُۥ يَشْرَحْ صَدْرَهُۥ لِلْإِسْلَـٰمِ ۖ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُۥ يَجْعَلْ صَدْرَهُۥ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِى ٱلسَّمَآءِ ۚ كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [البقرة:125]

‘সুতরাং যাকে আল্লাহ হিদায়াত করতে চান, ইসলামের জন্য তার বুক উন্মুক্ত করে দেন। আর যাকে ভ্রষ্ট করতে চান, তার বুক সঙ্কীর্ণ-সঙ্কুচিত করে দেন, যেন সে আসমানে আরোহণ করছে। এমনিভাবে আল্লাহ অকল্যাণ দেন তাদের উপর, যারা ঈমান আনে না’।

হে আল্লাহ, আমাদের বক্ষগুলোকে আপনার হিদায়াতের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। আমাদের সন্তাদের আপনার সন্তুষ্টিমাফিক গড়ে তোলার তাওফীক দেন। আমীন।

ইলম অর্জনে শিশু

ইলম অর্জন, জীবন ও জগৎ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা লাভ, ইহ ও পরকালীন কল্যাণের পথ পথান্তর বিষয়ে স্পষ্ট দিক-নির্দেশনা অর্জন শিশুর একটি মৌলিক অধিকার। এ অধিকার প্রদানে, এ বিষয়ে শিশুর যথাযথ পরিচর্যায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্থাপন করেছেন সর্বোচ্চ আদর্শ। আমাদের সালাফে সালেহীনও এক্ষেত্রে রেখেছেন উজ্জ্বল উদাহরণ।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জ্ঞান অন্বেষণ প্রতিটি মুসলিমের জন্য ফরয বলে ঘোষণা করেছেন। (দ্রঃ আল মাকাসিদুল হাসানা: ৬৬০)

জ্ঞান অন্বেষণ সর্বোত্তম ইবাদত। আর এ ইবাদত চর্চার জীবনব্যাপী চলমান প্রক্রিয়া শুভ শুরু শিশুকাল থেকেই শুরু হওয়া আবশ্যক; কেননা শিশুকালে লুব্ধ জ্ঞান পাথরে খচিত রেখার মতোই, যা কখনো মুছে যাবার নয়।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: যে ব্যক্তি শিশুকালে কুরআন শিখল, কুরআন তার রক্তমাংসের সাথে মিশে গেল, আর যে ব্যক্তি বৃদ্ধ বয়সে কুরআন শিখল, আর কুরআন তার কাছ থেকে ছুটে যাওয়া সত্ত্বেও সে লেগে রইল, তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ ছোয়াব। [দায়লামি, হাকেম]

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন: যে ব্যক্তি বয়ঃপ্রাপ্তির পূর্বেই কুরআন শিখল তাকে প্রজ্ঞা দিয়ে ভূষিত করা হলো।

খতিব আল বাগদাদি ইলম শেখানোর ব্যাপারে সালাফে সালেহীনের উদ্যোগ-আগ্রহের একটি দীর্ঘ বর্ণনা দিয়েছেন যার কিছু অংশ এখানে তুলে দেওয়া হলো:

হাসান বলেছেন: আমাদের হাতে আপনাদের শিশুদের তুলে দিন, কেননা তারা হলো শূন্য হৃদয়, তারা যা শোনে তা সংরক্ষণ করে রাখতে অধিক সক্ষম।

সাঈদ ইবন রাহমা আল-আসবাহী বলেন: আমি রাতে আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারকের মজলিসে সবার আগে যেতাম, আমার সঙ্গী-সাথী ছিল যারা কখনো আমার পূর্বে যেতে পারত না। আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক বৃদ্ধদের সঙ্গে নিয়ে প্রবেশ করতেন। তারা একবার আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারককে বললেন: এসব বাচ্চারা আমাদেরকে পরাহত করে দিয়েছে। প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন: আপনাদের তুলনায় এরাই আমার অধিক আশার পাত্র। আপনারা আর কয়দিন বাঁচবেন, আর ওরা, আশা করা যায় যে আল্লাহ তাদেরকে দীর্ঘ জীবন দেবেন। সাঈদ বলেন: তাদের মধ্যে আমাকে ছাড়া আর কেউই আজ বেঁচে নেই।

ইমাম আ'মাশ বলেন: আমি ইসমাঈল ইবন রাজাকে দেখেছি, তিনি বাচ্চাদের মকতবে যেতেন, তাদের সাথে কথা বলতেন; যাতে তার কথাগুলো বিশ্রুত না হয়।

হাসান ইবন আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তার ও তার বোনের ছেলেদেরকে বলতেন: ইলম শিখ; কেননা কওমের মধ্যে তোমরা এখন ছোট, আর আগামীকাল তোমরাই হবে বড়। তাই তোমাদের

মধ্যে যে মুখস্থ না করে সে যেন লিখে সংরক্ষণ করে। (খতিব আল বগদাদি: আল কিফায়া ফি ইলমির রিওয়ায়া)

আতা ইবন আবি রাবাহ বাচ্চাদের উদ্দেশ্য করে বলতেন: তোমরা লেখ, আর যে ভাল করে লেখা জানে না তাকে আমরা লিখে দেব, আর যার সাথে খাতা-কলম নেই, তাকে আমরা এগুলো আমাদের কাছ থেকে দেব। (আল মুহাদ্দিসুল ফাযেল: পৃষ্ঠা ৩)

বদিউযযামান হামাদানি তার এক বোনপুত্রকে ইলম তলবে সিরিয়াস হতে বলে চিঠি লিখে বলেন: যতদিন ইলম নিয়ে মশগুল থাকবে, মাদরাসাকে তোমার থাকার জায়গা বানিয়ে রাখবে, কলমকে সঙ্গী ও খাতাকে বন্ধু বানিয়ে রাখবে ততদিন তুমি আমার সন্তান বলে স্বীকৃতি পাবে। আর যদি এ ব্যাপারে কোনো ত্রুটি হয় তবে আমি তোমার মামা নই, অন্য কাউকে মামা হিসেবে গ্রহণ করো। ওয়াসসালাম। (আল-হিদায়া আল ইসলামিয়া: ২২৮)

লোকমান হাকিম একদা তার ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন: তোমার প্রজ্ঞা অর্জন কতদূর হলো? উত্তরে তিনি বললেন: আমার জন্য যা গুরুত্বপূর্ণ নয়, আমি তাতে মাথা ঘামাই না। লুকমান হাকিম বললেন: হে আমার ছেলে! আরেকটি বিষয় বাকি রয়ে গেছে, তাহলো, তুমি আলেমদের সাথে বসবে, ভিড় ঠেলে হলেও তাদের কাছে যাবে। কেননা আল্লাহ তাআলা হেকমত দ্বারা মৃত হৃদয়গুলোকে জীবিত করেন, যেমনি জীবিত করেন বৃষ্টি বর্ষিয়ে মৃত জমিন। (মুয়াত্তায়ে ইমাম মালেক: ২/১৬১)

তিনি আরো বলেন: হে আমার সন্তান! তুমি তিনটি উদ্দেশ্যে ইলম তলব করো না। আর তিন কারণে ইলম তলব বন্ধ করো না:

১. অযাচিত ঝগড়ায় লিপ্ত হওয়ার জন্য ইলম তলব করো না।

২. গর্ব করার উদ্দেশ্যে ইলম তলব করো না।

৩. লোক-দেখানোর উদ্দেশ্যে ইলম তলব করো না।

১. ইলম তলবে অনীহার কারণে ইলম তলব ছেড়ো না।

২. লোকলজ্জায় তুমি ইলম তলব ছেড়ো না।

৩. অজ্ঞ থাকার প্রতি রাজি হয়ে তুমি ইলম তলব ছেড়ো না।

তিনি আরো বলেন: আলেমদের সাথে তুমি ঝগড়া করতে যেও না। এরূপ করলে তাদের কাছে তুমি হালকা হয়ে যাবে। তারা তোমাকে প্রত্যাখ্যান করবেন। যারা নির্বোধ তাদের সাথেও বিতণ্ডায় যেও না, কেননা এরূপ করলে তারা তোমার সাথে মূর্খতাপূর্ণ আচরণ করবে, তোমাকে গালি দেবে। তুমি বরং সবর করবে, জ্ঞানে যে ব্যক্তি তোমার ঊর্ধ্বে তার জন্য এবং যে নিচে তার জন্যও, কারণ আলেমদের সারিতে গিয়ে তারাই যুক্ত হতে পারে যারা তাদের জন্য ধৈর্য ধরবে, তাদের সাথে লেগে থাকবে। সুন্দর ও বিনম্রভাবে তাদের ইলম থেকে আহরণ করবে।

আব্দুল মালেক ইবন মারওয়ান তার ছেলেদেরকে উপদেশ দিয়ে বলেন: তোমরা ইলম শিক্ষা করো, ইলম শিক্ষা করলে তোমরা যদি মধ্যবর্তী অবস্থানে থাক, তাহলে তোমরা নেতা হয়ে যাবে। আর যদি নিম্নবর্তী অবস্থানে থাক তা হলে বেঁচে থাকতে সক্ষম হবে।

উল্লিখিত উদ্‌ধৃতিগুলো থেকে সহজেই প্রতীয়মান হচ্ছে, আমাদের সালাফে সালেহীন শিশু সন্তানদেরকে ইলম শেখাতে কতটুকু গুরুত্ব দিতেন, আগ্রহ-উৎসাহ বহন করতেন?

সালাফে সালেহীনদের পদাঙ্ক অনুসরণ আমাদের ছেলে সন্তানদেরকে যথার্থরূপে ইলম, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা শেখাতে আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক দান করেন। আমিন।

সন্তানকে সালাতের নির্দেশ দান

আব্দুল্লাহ ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি, তিনি ইরশাদ করেন,

أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهْوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهْوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْؤُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهْوَ مَسْؤُولٌ عَنْهُ أَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

'তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, আর সবাই তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে। ইমাম তথা জনতার নেতা একজন দায়িত্বশীল; তিনি তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন। পুরুষ দায়িত্বশীল তার পরিবারের; সে জিজ্ঞাসিত হবে তার দায়িত্ব সম্পর্কে। স্ত্রী দায়িত্বশীল তার স্বামীর গৃহ ও সন্তানের; সে জিজ্ঞাসিত হবে তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে। মানুষের (দাস) ভৃত্য দায়িত্বশীল মুনিবের সম্পদের, সে জিজ্ঞাসিত হবে তার মুনিবের সম্পদ সম্পর্কে। অতএব, সতর্ক থেকো, তোমরা সবাই দায়িত্বশীল আর সবাই জিজ্ঞাসিত হবে নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে।' (বুখারী : ৭১৩৮; মুসলিম : ৪৮২৮; আবূ দাউদ : ২৯৩০)

ইমাম নববী রহ. বলেন, তিনিই পূর্ণ 'দায়িত্বশীল', যিনি রক্ষণাবেক্ষণকারী, বিশ্বস্ত, নিজ দায়িত্ব ও নজরাধীন বিষয়ের কল্যাণ ও স্বার্থ সম্পর্কে সজাগ। এ থেকেই বুঝা যায়, তার নজরাধীন যত বিষয় রয়েছে, তার কাছে সে বিষয়ে ইনসাফ কাম্য। তার দুনিয়া ও আখিরাত এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের কল্যাণ কাম্য।

আজকাল অনেক বাবা-মাই মনে করেন সন্তানের খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা পর্যন্তই তাদের দায়িত্ব সীমিত। কখনো খেলাধুলা ও বস্তুগত আরও কিছুকে এর সঙ্গে যোগ করা হয়। অথচ তারা তাদের সার্বিক কল্যাণ বয়ে আনতে পারেন না। কারণ তাদের গুরুত্বের সবটুকু জুড়ে থাকে শারীরিক প্রতিপালন, কখনো বুদ্ধিবৃত্তিক লালনকেও এর সঙ্গে যোগ করা হয়। তবে রুহ তথা আত্মার খোরাক সম্পর্কে উদাসীনতা দেখানো হয়। অথচ বাস্তবে মানুষ প্রথমে রূহ, তারপর বুদ্ধি অতপর দেহ।

সন্তানকে দুনিয়াদারির সঙ্গে সঙ্গে আখিরাতের প্রস্তুতির শিক্ষা দিতে হবে। জাগতিক সব শিক্ষা-দীক্ষার পাশাপাশি পারলৌকিক জ্ঞানও দিতে হবে। শরীয়তের যাবতীয় হুকুম-আহকামের ইলম শেখাতে হবে। শুধু ধারণা দেয়াই যথেষ্ট নয়; সার্বিক তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে তার অনুশীলনও করাতে হবে। মৌলিক দীনী জ্ঞান এবং আমল-ইবাদত শেখাতে হবে। আর ঈমানের পর সবচে গুরুত্বপূর্ণ ও অধিক চর্চিত আমল হলো সালাত। সন্তানকে তাই সালাত আদায় করা শেখাতে হবে। শিক্ষা দিতে হবে সালাত আদায়ের জন্য প্রয়োজনীয় ইলম।

সালাতের অপরিসীম গুরুত্বের কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শৈশব-কৈশোর থেকেই সন্তানকে সালাতে অভ্যস্ত করাতে বলেছেন। অথচ সাধারণ মুসলিমরা তো দূরের কথা, আমরা যারা নিয়মিত সালাত আদায় করি, শরীয়তের গণ্ডির মধ্যে থেকে জীবন যাপনের চেষ্টা করি, তারাও এ ব্যাপারে কর্তব্যে অবহেলা করি। নিজে ঘুম থেকে জেগে ফজরের সালাত আদায় করতে মসজিদে যাই অথচ পাশের ঘরে ঘুমিয়ে থাকা সন্তানকে ডেকে সঙ্গে নিয়ে যাই না।

অনেকে সন্তানের ঘুম ভাঙ্গানোকে ভালোবাসার অন্তরায় ভেবে এ ব্যাপারে উদাসীনতা দেখান। তারা কি জানেন, সাহাবীদের বাণী হিসেবে অনেক সময় বলা হয়ে থাকে, কিয়ামতের দিন সন্তানরা পিতামাতার পেছনে লেগে থাকবে। তারা চিৎকার করে বলবে, হে পিতা, আপনি আমাকে ধ্বংস করেছেন কেন?!! তারপরও কিভাবে পিতা-মাতারা কলিজার টুকরা সন্তানদের জাহান্নামের জ্বালানি হিসেবে বেড়ে উঠতে দেন?!! বরং তারা জাহান্নামে পৌঁছার সব সামগ্রী তাদের জন্য ক্রয় করে দেন। এমনটি হবার কারণ সাধারণ পিতা-মাতার ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা আর যারা ইসলাম সম্পর্কে জানেন, তাদের ইসলামের নির্দেশনা মতো সন্তানের লালন-পালন সম্পর্কে না জানা। এর সিংহভাগই সন্তানের প্রতি তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে। এ কারণেই পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ মানবিক দায়িত্ব, যা সীমাহীন গুরুত্বের দাবি রাখে। তাই মুসলিম নর-নারীকে এ দায়িত্বের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা উচিত। মুসলিম বিদ্যালয়গুলোর কর্তব্য আগামী প্রজন্মকে এ দায়িত্বের জন্য উপযুক্ত হিসেবে গড়ে তোলা। তাদেরকে এ দায়িত্বের সঙ্গে যথাযথভাবে পরিচিত করা।

কখন সন্তানকে সালাতের নির্দেশ দেয়া হবে

১. সাবরা বিন মা‘বাদ জুহানী থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مُرُوا الصَّبِيَّ بِالصَّلاَةِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ وَإِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا.

‘বাচ্চাদের সালাতের নির্দেশ দাও, যখন তাদের বয়স হয় সাত বছর এবং যখন তাদের বয়স দশ বছর হয় তখন এ জন্য তাদের প্রহার করো।’ (আবূ দাউদ : ৪৯৪)

২. আমর বিন শুয়াইব তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِى الْمَضَاجِعِ.

‘তোমাদের সন্তানদের সাত বছর হলে তাদের সালাতের নির্দেশ দাও, তাদের বয়স দশ বছর হলে এ জন্য তাদের প্রহার করো এবং তাদের পরস্পরে বিছানা পৃথক করে দাও।’ (আবূ দাউদ : ৪৯৫; মুসনাদ আহমদ : ৬৬৮৯)

৩. মু‘আয বিন আব্দুল্লাহ বিন হাবীব আল-জুহানী সূত্রে হিশাম বিন সা‘দ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

دَخَلْنَا عَلَيْهِ ، فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: مَتَى يُصَلِّي الصَّبِيُّ؟ فَقَالَتْ: كَانَ رَجُلٌ مِنَّا يَذْكُرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِذَا عَرَفَ يَمِينَهُ مِنْ شِمَالِهِ، فَمُرُوهُ بِالصَّلاَةِ

‘আমরা হিশামের কাছে গেলাম। তিনি তার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, শিশু কখন সালাত আদায় করবে? তিনি বললেন, আমাদের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বলতেন তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। এর উত্তরে তিনি বলেন, ‘যখন সে তার ডানকে বাম থেকে আলাদা করতে পারবে, তখন তাকে সালাতের নির্দেশ দাও’।’ (আবূ দাউদ : ৪৯৭; বাইহাকী, সুনান আল-কুবরা : ৫২৯৬)

‘অর্থাৎ শিশু যখন ডান ও বামের মাঝে পার্থক্য করতে পারবে। আর সাধারণত এ যোগ্যতা সপ্তম বছরে পৌঁছার পরই হয়।’ (আউনুল মা‘বুদ : ২/১৬৫)

৪. আব্দুল মালেক বিন রবী‘ বিন সাবরা তার বাবা থেকে এবং তিনি দাদা সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلاَةَ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشْرٍ

‘বাচ্চাকে সালাত শিক্ষা দাও যখন সে সাত বছর বয়সী হয় এবং এর জন্য তাকে প্রহার করো যখন সে দশ বছর বয়সী হয়।’ (তিরমিযী : ৪০৭; ইবন খুযাইমা : ১০০২; তাবরানী, আল-মু‘জামুল কাবীর : ৬৪১৮।)

৫. আমর বিন শুয়াইব তার পিতা থেকে এবং পিতা দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

‘সাত বছর বয়সে তোমাদের সন্তানদের সালাতের নির্দেশ দাও এবং দশ বছর বয়সে এর জন্য তাদের প্রহার করো আর তাদের পরস্পরের বিছানা পৃথক করে দাও।’ (মুসনাদ আহমদ : ৬৭৫৬; মুসান্নাফ, আবদুর রাযযাক : ৭২৯৫।)

৬. আবূ রাফে‘ রাদিয়াল্লাহু তা’আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

وَجَدْنَا صَحِيفَةً فِي قِرَابِ سَيْفِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ ، وَفَاتِهِ فِيهَا مَكْتُوبٌ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، فَرِّقُوا بَيْنَ مَضَاجِعِ الْغِلْمَانِ وَالْجَوَارِي، وَالإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ لِسَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوا أَبْنَاءَكُمْ عَلَى الصَّلاَةِ إِذَا بَلَغُوا أَظُنُّهُ تِسْعًا.

‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর আমরা তাঁর তরবারীর খাপের মধ্যে একটি ছহীফা দেখতে পেলাম। তাতে লিখা আছে : পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে, সাত বছর বয়সে ছেলেদের ও মেয়েদের এবং ভাইদের ও বোনদের বিছানা পৃথক করে দাও। আর তোমাদের সন্তানদের সালাতের জন্য প্রহার করো যখন তারা (আমার ধারণা তিনি বলেছেন) নয় বছরে পৌঁছে।’ (মুসনাদ বাযযার : ৩৮৮৫।)

কাতারে বাচ্চাদের অবস্থান

আবূ মালেক আশ‘আরী রাদিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু থেকে বর্ণিত,

أَلاَ أُحَدِّثُكُمْ بِصَلاَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: فَأَقَامَ الصَّلاَةَ، وَصَفَّ الرِّجَالَ وَصَفَّ خَلْفَهُمُ الْغِلْمَانَ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ فَذَكَرَ صَلاَتَهُ، ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا صَلاَةُ - قَالَ عَبْدُ الأَعْلَى: لاَ أَحْسَبُهُ إِلاَّ قَالَ: صَلاَةُ أُمَّتِي - .

‘আমি কি তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সালাত সম্পর্কে বলব না? তিনি বলেন, অতপর তিনি সালাত কায়েম করেন। পুরুষদের কাতার করেন, তাদের পেছনে বাচ্চাদের কাতার করেন এবং তাদের নিয়ে সালাত আদায় করেন। অতপর তিনি তাঁর সালাতের উল্লেখ করেন এবং বলেন, এমনই সালাত। আব্দুল আ‘লা বলেন, আমার মনে তিনি বলেছেন, (এমনই) আমার উম্মতের সালাত। (আবূ দাউদ : ৬৭৭; তাবরানী)

হাদীসটি এ কথা প্রমাণ করে যে, পুরুষের কাতার হবে শিশুদের কাতারের আগে আর শিশুদের কাতার হবে নারীদের কাতারের আগে। তবে শিশুর সংখ্যা দুই বা ততোধিক হলে এ কথা প্রযোজ্য। অন্যথায় শিশু একজন হলে সে পুরুষদের কাতারে ঢুকে পড়বে। কাতারের পেছনে সে একা দাঁড়াবে না। ইমাম সাবকী এই মত প্রদান করেছেন।

সালাতের গুরুত্ব

আল্লাহ তা‘আলা আমাদের ওপর দিনে-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা আমাদের যা-ই নির্দেশ দিয়েছেন, তার সুফল ও উপকারিতা আমরা দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে লাভ করি। সালাতের উপকারিতার মধ্যে রয়েছে : আত্মিক প্রতিপালন, খাদ্য ও পানীয় দেহের বৃদ্ধি ঘটায়। আর রূহের বৃদ্ধি ঘটে যখন সে তার স্রষ্টার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে সালাত, কুরআন তিলাওয়াত, রোজা, হজ, জিকির, দু‘আ ও ইবাদতের মাধ্যমে।

আর সালাত হলো আত্মার পরিচর্যার সর্বোত্তম মাধ্যম। এ কারণে আল্লাহ তা‘আলা আমাদের ওপর দিন-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করেছেন। যাতে রূহের সঙ্গে তার রবের যোগাযোগ অবিচ্ছিন্ন থাকে এবং তা দুর্বল না হয়ে পড়ে। সাথে সাথে যাতে দেহ তার কামনা ও রিপুসহ ব্যক্তির ওপর বিজয়ী না হয়। আল্লাহ তা‘আলা দেহকে সৃষ্টি করেছেন রূহের একটি বাহন হিসেবে। রূহ যখন মানুষের দেহকে পরিচালনা করে তখন মানুষ সত্যিকার মানুষে পরিণত হয়। পক্ষান্তরে রূহ যখন দেহের অনুগত হয়ে পড়ে মানুষ তখন তার মনুষ্যত্ব থেকে শূন্য হয়ে পড়ে।

এখানেই সালাতের গুরুত্ব নিহিত। সালাত তাই দীনের স্তম্ভ। যে ইচ্ছাকৃতভাবে সালাত ত্যাগ করে সে যেন কাফির হয়ে পড়ে। এ থেকেই সন্তানকে সালাতের প্রশিক্ষণ দেয়ার গুরুত্ব বুঝা যায়। সন্দেহ নাই এর গুরুত্ব কুরআন, লেখাপড়া ও হিসাব-নিকাশ শেখানোর চেয়ে বেশি। পিতা-মাতারা কি এর গুরুত্ব অনুধাবন করেন? কত অভিভাবকই তো আছেন যারা তাদের সন্তানকে দশ বছর যাবৎ বিদ্যালয়ে আনা-নেয়া করেই ক্লান্ত। কখনো তারা তাদের হোমওয়ার্ক করাতে গিয়ে রাত্রি জাগরণও করেন। অথচ সন্তানদের সালাতের গুরুত্ব সম্পর্কে অধিকাংশ পিতা-মাতাই বেখবর। অনেক উদাসীন মুসলিম মনে করেন তার সন্তান বড় হলে ঠিকই সালাত আদায় করবে। সাবালক না হওয়া পর্যন্ত তার আর সালাত কী! অথচ অধিকাংশ পিতা-মাতাকেই দেখা যায় তাদের সাবালক সন্তানের সালাতের ব্যাপারেও গাফেল। তাদেরকে সালাতের জন্য কোনো কথাই বলেন না। আর

সন্তানদের দেখা যায় বাবা-মা'র সঙ্গে সালাতের ব্যাপারে চালাকি ও ধুর্তামি করতে। তারা মনে করে এখন কেন আমরা তো বুড়ো বয়সে তারা সালাত কায়েম করবো।

সাত বছরে কেন সালাতের নির্দেশ?

সাত বছর বয়সে মানুষ তার জীবনের দ্বিতীয় পর্ব শুরু করে। একে বলা হয় শৈশবের সমাপ্তিকাল অথবা বুদ্ধির বিকাশকাল। এ পর্বের কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন :

১. বিদ্যালয়ে ভর্তির সময় শিশুর বুদ্ধির দিগন্ত প্রসারিত হয়। সে নিত্য অভিজ্ঞতা অর্জন করে এবং তার সামাজিক পরিবেশের ব্যপ্তি ঘটে।

২. এ পর্বে শিশু প্রশংসা ও স্তুতি পছন্দ করে। এ প্রশংসা ও ধন্যবাদ পেতে সে তার বড়দের (পিতামাতা, শিক্ষক) সন্তুষ্ট করতে চায়। বোধসম্পন্ন শিশুকে যা মুরুব্বিদের সামনে বিনম্র করে। সে তাদের অবাধ্য হয় না। বরং গুরুত্ব দিয়ে তাকে যা নির্দেশ দেয়া হয় সে তা বাস্তবায়ন করে।

৩. জীবন সংশ্লিষ্ট নানা বিষয় সম্পর্কে সে জানতে পারে। ধারণা পেতে থাকে সে চারিত্রিক মাপকাঠি, মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি গঠন, দায়িত্ব বহনের জন্য প্রস্তুতি ও আবেগ নিয়ন্ত্রণসহ প্রভৃতি বিষয়। এ জন্যই এ পর্বকে সামাজিক অধ্যয়নের সবচে উপযুক্ত পর্ব হিসেবে গণ্য করা হয়।

৪. সাত বছরের সমাপ্তি অবধি পিতা-মাতা পর্যন্তই শিশুর শিক্ষাগ্রহণ সীমিত থাকে। প্রাথমিক শিক্ষার প্রথম শ্রেণী পর্যন্ত শিশু তার শিক্ষকের চেয়ে পিতামাতা থেকেই বেশি গ্রহণ করে থাকে। বিদ্যালয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত শিশু তার পিতা-মাতার কাছ থেকে তার সব কৌতূহল নিবারণ করতে চায়। ফলে তার পিতা-মাতা তাকে যা-ই বলেন, সেটাকে সে সঠিক বলেই মনে করে। এ পর্বের পর শিশু ক্রমশ পিতামাতার সুদৃঢ় প্রভাববলয় থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করে। অষ্টম ও নবম বছরে পৌঁছে স্বার্থক শিক্ষকের প্রভাব পিতা-মাতার প্রভাবের সমান হয়ে যায়। আর বয়োসন্ধির সূচনায় পিতামাতার কর্তৃত্ব থেকে তার স্বাধীন হয়ে যাওয়াই প্রমাণ করে যে সেদিনের শিশুটি আজ সাবালক হয়ে পড়েছে।

৫. যেহেতু সপ্তম বছরে পদার্পণ করে শিশু ভালো-মন্দের পার্থক্য বুঝতে শুরু করে এবং প্রশংসা ও সুনাম কুড়ানোর মানসে পিতামাতাকে সন্তুষ্ট করতে সচেষ্ট হয়, তাই এ বয়সে যদি তাকে সালাতের নির্দেশ প্রদান করা হয়, তবে সে হৃষ্ট চিত্তে ও খুশি মনে নির্দেশ বাস্তবায়নে উদ্যোগী হবে। পক্ষান্তরে একাদশ ও তার পরবর্তী বছরগুলোতে বিনা বাক্য ব্যয়ে পিতা-মাতার নির্দেশ মেনে নেয়াকে সে এখনো শিশু থাকার প্রমাণ বলে ভাবে, যা সে ছেড়ে আসতে চায়। আর সাবালক হবার পর অনেক সন্তান তার পিতামাতার বিরুদ্ধাচারণকে তাদের যৌবন ও তারুণ্যের প্রতীক মনে করে।

৬. শৈশবের সূচনা ও সমাপ্তিকাল অতিক্রমকালে শিশু চায় বড়দের অনুকরণ করে নিজেকেও বড় হিসেবে প্রকাশ করতে। এ সময় তাকে ছোট বলা হলে সে ব্যথিত হয়। এ কারণে আপনি তাদের দেখবেন তারা সতীর্থদের সঙ্গে বিদ্যালয়ে যেতে এবং বড়দের মতো মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করতে আগ্রহী থাকে।

শিশুকে কখন সালাত শেখাতে হবে

বলাবাহুল্য যে শিশুকে সালাতের নির্দেশ দানের আগে তাকে তা শেখাতে হবে। সে যা চেনে না আমরা তার নির্দেশ দেই কী করে? তাইতো ইবন আবিদ্দুনইয়া রহ. আবদুল্লাহ ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, তিনি শিশুদের সালাত শেখাতেন যখন তারা ডান থেকে বাম শিখত। জুনদুব বিন আবী ছাবেত থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (সাহাবীদের) শিশুরা যখন বিশ পর্যন্ত গুনতে শিখতো তখনই তাঁরা তাকে সালাত শিক্ষা দিতেন। (আল-ইয়াল : ১/৪৭৩।)

শিশু পঞ্চম বছরে পৌঁছলে তাকে অযূর ফরয, সালাতের রুকন শেখাতে হবে। সূরা ফাতিহা মুখস্থ করাতে হবে। রুকূ' ও সিজদা শেখাতে হবে। শিশু হলো আদর্শ অনুকরণকারী। সে যখন তার পিতামাতাকে সালাত আদায় করতে দেখবে, তখন সেও তাদের অনুকরণ করতে শুরু করবে। এ জন্য পিতামাতার উচিত নিজেদের সালাতকে শুদ্ধ করা এবং সুন্নত তরীকায় ও সঠিক পদ্ধতিতে সালাত আদায় করা। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে সঠিক পদ্ধতিতে নিজে সালাত আদায় করা এবং সন্তানদের সালাত শিক্ষা দেবার তাওফীক দান করুন। আমাদের সন্তানগুলোকে সাহাবীদের সন্তানের মতো আদর্শ মানুষ বানিয়ে দিন। আমীন।

সন্তানের ক্যারীয়ার গঠনে পিতা-মাতার কর্তব্য

সন্তানদের উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষনের মাধ্যমে এমনভাবে সক্ষম করে গড়ে তোলা, তারা যেন উপার্জন করার মত যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে এভাবে বলেছেন, তোমাদের সন্তান সন্ততিদেরকে সক্ষম ও সাবলম্বি রেখে যাওয়া, তাদেরকে অভাবী ও মানুষের কাছে হাত পাতা অবস্থায় রেখে যাওয়ার চেয়ে উত্তম। [সহীহ বুখারী:১২৯৫]

তবে এই কাজটি নিয়ত সহিহ রেখে এবং মহান আল্লাহর স্মরন থেকে শরীয়তের সীমালংঘন না করে করা হলে ইন শা আল্লাহ ইবাদাত হিসেবে মহান আল্লাহ গ্রহন করবেন।

আর এই ক্যারীয়ার গঠনের পিছনে ছুটতে যেয়ে আবার অনেকে ভারসাম্যহীন হয়ে যায়, ফলে দেখা যায় অনেক সন্তান মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। এর পিছনে বড় এক কারন পিতা মাতার অতিরিক্ত অভিলাস পূরনে সন্তানকে মানসিক চাপে রাখা। সামাজিক প্রেক্ষাপট প্রতিযোগীতামূলক হয়ে যাওয়ায় এর সাথে খাপ খেতে না পারাটা আরেকটি কারন।

এইক্ষেত্রে পরিবার থেকেই সহজ সুন্দর পরামর্শ ও সহযোগীতা প্রয়োজন। পরিবারের সহযোগীতা পেলে সামাজিক পরিবেশগত সমস্যাকে সন্তানেরা ওভারকাম করে নিতে পারে।

ক্যারীয়ার গঠনের মূল অবস্থা শুরু হয় স্কুল কলেজের পড়াশুনার মাধ্যমে। আর তাই এই ক্ষেত্রগুলোতে পরীক্ষার ফলাফল ভালো করার জন্য প্রতিযোগীতা শুরু হয়ে যায়। একদিকে এটা ভালো তবে যখন অতিরিক্ত চাপ সমভাবে সব সন্তানের উপর পরিবার ও শিক্ষাংগন থেকে আসে তখনই সমস্যা দেখা দেয়। তাই পরিকল্পিতভাবে সন্তানের যোগ্যতা সামর্থের দিকে নজর রেখেই

পরিশ্রম করার তাগিদ দিতে হবে। সব সন্তান একরকম অবস্থায় আসতে পারে না, এটাই প্রকৃতিগত ব্যাপার। মহান আল্লাহ একেকজনকে একেকরকম যোগ্যতা দিয়ে পাঠিয়েছেন যেন সমাজ ব্যবস্থা টিকে থাকে পারস্পরিক সহযোগীতা ও সুন্দর সম্পর্কের মাধ্যমে, এটা জানা ও বুঝা প্রয়োজন।

বছরের বিভিন্ন সময়ে ঘরে ঘরে সন্তান সন্ততিদের বিভিন্ন স্তরে পরীক্ষার পর্ব চলে। স্কুল কলেজ, ভার্সিটি, মাদ্রাসা, বিভিন্ন জায়গায় পরীক্ষা। এই পরীক্ষা যেন আজ সমাজে মা-বাবাদেরও পরীক্ষার একটি অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রায় প্রতিটি পরিবারে যেন আজ একই চিন্তা যেন আদরের সন্তানটি পরীক্ষায় ভালো ফল লাভ করে। সুবহানা আল্লাহ। অনেক বাবা মায়েরা নফল ইবাদাত করে থাকেন যেন মহান আল্লাহর সাহায্য পেয়ে সেই কাজটিতে উত্তীর্ণ হতে পারে। আলহামদুলিল্লাহ।

তাই যা লক্ষ্যনীয় –সন্তানদের জন্য

কুর’আনের ও হাদীসের জ্ঞান অল্প হলেও প্রতিদিনের রুটিনে রাখা

1. ফরয সালাত যেনো কোনভাবেই বাদ না যায়।
2. অস্থির হয়ে আচরন খারাপ যেন না হয়।
3. অতিরিক্ত রাত জেগে শরীরের হক যেন নষ্ট না হয়।
4. মিথ্যা বা দুর্নীতিপরায়ন সম্পন্ন কোন কাজের চিন্তা যেনো না আসে।
5. মহান আল্লাহর উপর ভরসা করে তাঁর সাহায্য চাইতে থাকতে হবে।
6. সব সময় মহান রবের নামে পড়া শুরু করবে।
7. কোন বন্ধু পরীক্ষার হলে সাহায্য করবে এই ধরনের অশুভ চিন্তা সরিয়ে নিজের যোগ্যতাকে কাজে লাগানোর প্রস্তুতি নিতে হবে।
8. সমাজের অন্যদের কারচুপি করা দেখেও নিজেকে সত্যের পথে রাখতে হবে।
9. মনে রাখা প্রয়োজন মহান আল্লাহ তাকদীরে যা রেখেছেন তা অতিক্রম করা যাবে না।
10. নিজের প্রচেষ্টার পুরুটাই কাজে লাগিয়ে আল্লাহর উপর ভরসা করতে হবে, এরপর যা ফলাফল আসে তা ই তাকদীর, সেটা আলহামদুলিল্লাহ বলে মেনে নেয়ার মানসিকতা রাখতে হবে। এখানেই কল্যান রয়েছে।
11. জীবনের এই পরীক্ষাই সব নয়, তাই অস্থির বা হতাশ হওয়ার কোন কারন নেই।
12. মহান আল্লাহর উপর যে ভরসা করে প্রচেষ্টা চালায়, আল্লাহ তার রিযিক(এখানে পরীক্ষায় ফল লাভ) বাড়িয়ে দেন। কাজটি সহজ করে দেন।
13. মনে রাখতে হবে রিযিক ও সম্মানের মালিক আল্লাহ, তিনি যাকে ইচ্ছা বাড়িয়ে দেন বা কমিয়ে দেন, তাই মহান আল্লাহর দিকে একান্তভাবে নির্ভর করে সত্য পথ ধরে পরিশ্রম করে যেতে হবে।

অভিভাবকদের জন্য—

14. মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাকে ভালোবাসেন বেশী, সেই তুলনায় মা বাবা সন্তানকে কতটুকু ভালোবাসেন তা আমরা হাদীস থেকে জানি। মহান আল্লাহ মাত্র একভাগ ভালোবাসা পুরু সৃষ্টির মাঝে দিয়েছেন। তাই মহান আল্লাহ আমাদের সন্তানদেরও সেইভাবে কল্যান দিবেন।

দুনিয়ার এই অস্থায়ী জীবনের ফলাফলের চেয়ে আখেরাতের স্থায়ী জীবনের ফলাফল এর প্রয়োজনীয়তা সব সময় মাথায় রাখা প্রয়োজন এবং তা সন্তানদের মাঝেও বিস্তার করাতে হবে।

তাই অন্যায় কোন পদ্ধতি যেনো অনুসরন না করে এখনি নৈতিকতার ও সত্যের প্রতিক হওয়ার শিক্ষা দিতে হবে। এই একটি পরীক্ষা নয়, দুনিয়ার জীবনে অসংখ্য পরীক্ষা দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে আপনার সন্তানকে।

15. ভবিষ্যত আমরা দেখিনা বা বলতে পারিনা, মহান আল্লাহ সব দেখেন ও জানেন, তাই প্রচেষ্টার পর যা ভাগ্যে আসে তা কল্যান বলে আস্থা রাখতে হবে এবং মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে হবে। সন্তানকেও বুঝতে দিতে হবে আল্লাহর উপর কিভাবে খুশি থাকতে হয়।
16. রাগের বশবর্তী হয়ে কখনো সন্তানকে বকা ঝকার পাশাপাশি অভিশাপ দিয়ে নিজে গুনাহগার ও সন্তানের জীবনে অকল্যান নিয়ে আসার সুযোগ করে দিবেন না। মানুষের বিশেষ করে পিতা মাতার দু'আ যেকোন সময় কবুল হয়ে যেতে পারে, তাই সময় থাকতেই সতর্ক থাকা প্রয়োজন। এই অভিশাপ দেয়ার অভ্যাস কখনো মুমিনের চরিত্রে থাকতে পারে না।
17. সন্তানকে আদর ও যত্ন দিয়ে কাছে টেনে বুঝিয়ে বলুন। তার শারিরীক ও মানসিক সুস্থ্যতার গুরুত্ব তুলে ধরুন। বুঝতে দিন আপনি তাকে কত ভালোবাসেন এবং জান্নাতেও একসাথে থাকতে চান, তাই এতো দিক নির্দেশনা দেয়া।
18. এই ধরনের অবস্থা দিয়েই সন্তানকে সবর ও আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করা শেখানো যায়।
19. তাই পিতা মাতাকে আগে সবর ও তাওয়াক্কুলের আচরন দেখাতে হবে এবং তা সন্তানকে বুঝতে দিতে হবে।
20. প্রতিটি অভিভাবকের কর্তব্য পরীক্ষার ফলাফলের জন্য বকা ঝকা না করে, বুঝানো ও পরিশ্রম করার জন্য উত্সাহিত করা। এইভাবে বলা যে, তুমি আল্লাহর নামে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাও তারপর যা ফলাফল আসবে সেটাতেই আমরা খুশি আলহামদুলিল্লাহ। তবে সন্তান যেন ঠিকভাবে পরিশ্রম করে সেদিকে তদারকি করা অভিভাবকদের কর্তব্য।
21. মহান আল্লাহর দরবারে বেশি করে দু'আ করুন সন্তানের স্বার্থক জীবনের জন্য।

কর্মজীবনে প্রবেশের ক্ষেত্রেও হালাল হারামের বিধান ও মহান রবের আনুগত্যের মাঝে থাকা যাবে কি যাবে না এই বিষয়টি সামনে আনার পরামর্শ দিতে হবে সন্তানকে। টাকা উপার্জনই জীবনের প্রতিষ্ঠা নয়, টাকার প্রয়োজন আছে তবে আখেরাতের জীবনের মুক্তি নিশ্চয়তা ঠিক রেখেই টাকা উপার্জনে ভূমিকা রাখতে হবে।

অভিভাবকদের সচেতন ও আদর্শ মুসলিম হিসেবে ভূমিকা রাখার মাধ্যমে ও সন্তানকে কুর'আনের আলোকে গঠনের প্রচেষ্টার মাধ্যমেই একমাত্র এই সমাজ থেকে অন্যায় ও দূর্নিতি দূর করা সহজ হতে পারে। আল্লাহ আমাদের বুঝার তাওফিক দিন।

আল্লাহ আমাদের সকল সন্তানদের সত্যের পথে থেকে আদর্শ মুসলিম হিসেব কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন জায়গায় স্বার্থক করে দিন, রিযিক ও সম্মান বাড়িয়ে দিন দুনিয়া ও আখেরাতে।আল্লাহ আমাদের

ঈমানের বলে বলীয়ান হয়ে পরিবার গঠনের জন্য পরিশ্রমী হওয়ার ও কামীয়াব হওয়ার সুযোগ করে দিন।

শাস্তি প্রদান : শরয়ি দৃষ্টিকোণ

প্রতিপালন ও প্রশিক্ষণ দান কালে শিশুদেরকে দায়িত্বশীল প্রশিক্ষকদের পক্ষ থেকে শাস্তি দেওয়া ও সাজার সম্মুখীন করাকে একটি কার্যকর ও ফলপ্রদ রীতি হিসাবে বিবেচনা করা হয়। শাস্তি প্রদান ও এর বিবিধ পন্থা-পদ্ধতি নিয়ে প্রশিক্ষণ বিজ্ঞানীদের মাঝে বিতর্ক বহু পুরাতন। পক্ষে ও বিপক্ষে দু'দিকেই মতামত বিদ্যমান। এক পক্ষ শাস্তি প্রদানের যাবতীয় পদ্ধতি প্রয়োগের বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে সংশ্লিষ্টদেরকে তা থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। কারণ এতে শাস্তিপ্রাপ্ত প্রশিক্ষাণার্থীর শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি সাধিত হয়। অপরপক্ষ শাস্তি প্রয়োগের পক্ষে জরালো সমর্থন ব্যক্ত করে বলেছেন, আদর্শ প্রজন্ম গঠন করতে হলে অবশ্যই এ কার্যকর রীতির প্রয়োগ ঘটাতে হবে। কারণ এটিই একমাত্র পদ্ধতি যা বিগড়ে যাওয়া শিশুকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে পারে অতি সহজে। সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলগণ ফলপ্রসূ এ রীতির সফল প্রতিফলন ঘটিয়ে কাঙ্খিত সফলতা লাভে সচেষ্ট হতে পারেন। এবং জাতিকে একটি সুসভ্য ও আদর্শ প্রজন্ম উপহার দিতে পারেন।

এদিকে সত্যনিষ্ঠ ধর্ম ইসলাম এ ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছে। শাস্তি প্রয়োগের রীতিকে একেবারে প্রত্যাখ্যানও করেনি। আবার অপরাধের প্রকৃতি, অপরাধীর অবস্থা ও সার্বিক পরিস্থিতি বিচার-বিবেচনা না করে এবং কোনো নীতিমালার অনুবর্তণ ছাড়াই প্রয়োগের লাগামহীন স্বাধীনতাও দেয়নি। ইসলাম শাস্তি প্রদান রীতিকে আচরণ সংশোধনের একটি কার্যকর পন্থা বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। এবং অন্য কোনো পদ্ধতি ফলপ্রসূ না হলে এ পন্থা অবলম্বনের অনুমতি দিয়েছে। কিছু মানুষ আছে, যাদেরকে ভুল পথ থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য ওয়াজ নসিহত ও সুপরামর্শে কোনো কাজ হয় না। তখন কার্যকর অন্য কোনো পন্থা অনুসরণের প্রয়োজন দেখা দেয়। আর এ থেকেই শাস্তি প্রয়োগের এই কঠিন ও চূড়ান্ত চিকিৎসা-পদ্ধতি গ্রহণের গুরুত্ব অনুভূত হয়।

সাজা: সংজ্ঞা ও লক্ষ্য

প্রশিক্ষণ বিজ্ঞানীরা সাজা তথা শাস্তি প্রদানের সঙ্গা দিয়ে বলেছেন, 'সাজা একটি প্রশিক্ষণ রীতি, যার লক্ষ্য হচ্ছে প্রশিক্ষণার্থীর মাঝে বিদ্যমান কু-অভ্যাস বিতাড়িত , প্রতিরোধ কিংবা মওকুফ করা'।

ইসলামি প্রশিক্ষণ বিজ্ঞানীরা উক্ত লক্ষ্যের সাথে আরো দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যুক্ত করেছেন-

এক. মন্দ কাজের অশুভ পরিণতি হতে অপর লোকদের বাঁচানো, যার অনিষ্টি এক সময় তাদেরকেও স্পর্শ করতে পারে।

দুই. সাধারণ জনগণকে সতর্ক করা- যাতে দন্ডিত ব্যক্তির সাজা প্রত্যক্ষকারী ও এ সম্বন্ধে জ্ঞাত সকলে সাবধান ও সংশোধন হয়ে যায় এবং কেউ এরূপ অপরাধের চিন্তা না করে। যেমন প্রকাশ্য শাস্তি প্রদান প্রসংগে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

(وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿2﴾ (النور:2

আর মুমিনদের একটি দল যেন তাদের আযাব প্রত্যক্ষ করে। (আন্ নূর:২)

সুতরাং ইসলামের ছায়াতলে বসবাসকারী শিশুদেরকে সাজা দানের মাধ্যমে কেবল তাদেরকে সংশোধন ও তার সাথে থাকা অপর লোকদেরকে সংরক্ষণ করাই উদ্দেশ্য নয় বরং এর সাথে সাথে সর্ব স্তরের জনসাধারণের জন্য শিক্ষা ও উপদেশ দানও এর অন্যতম লক্ষ্য।

প্রশিক্ষকদের শাস্তি প্রদান বিষয়ক তাৎপর্য সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা থাকা অপরিহার্য্য:

ইসলাম সব সময়ই একটি মধ্যপন্থী ও উদার মতাদর্শের নাম। সর্ব ক্ষেত্রে ইসলাম পরস্পর বিরোধী দুই মতাদর্শের মাঝামাঝিতে অবস্থান নেয়। এক পক্ষের মতামতকে অন্ধ-বধিরের ন্যায় পরিপূর্ণরূপে গ্রহণও করে না। আবার না বুঝে না শুনে একেবারে উপেক্ষাও করে না। আমাদের আলোচ্য বষয়েও সেই নীতিই গ্রহণ করেছে ইসলাম। সর্ব যুগের জন্য উপযোগী করে একটি শাস্তিবিধি প্রনয়ণ করেছে। সেটি কখন প্রয়োগ করা হবে এবং কি ভাবে ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত রূপরেখা দিয়েছে। এ ক্ষেত্রে ক্রমান্বয়িক নীতি গ্রহণের গুরুত্ব দিয়ে বাড়াবাড়ি ও সীমা লঙ্ঘন থেকে সতর্ক করেছে ইসলাম কঠিনভাবে। বিধিবদ্ধ করে দিয়েছে যে, শিক্ষাদান, চাল-চলন ও আচার ব্যবহারের ক্ষেত্রে মূল হচ্ছে নম্রতা ও কোমলতা। আর শাস্তি প্রদান হল 'একটি সাময়িক ও আপতিত বিষয়' যা কেবল অন্য সকল পদ্ধতি অকার্যকর হয়ে গেলে প্রয়োগ করা হয়। সুতরাং প্রশিক্ষণের এই রীতি প্রয়োগ করতে হলে আগে প্রশিক্ষকদেরকে রীতিটি সম্পর্কে বিশদভাবে জানতে হবে। অবস্থা, অবস্থান ও পরিস্থিতির অনুপূঙ্খ বিশ্লেষণের পরই কেবল প্রয়োগ করতে পারবে। সম্প্রতি মাঠ পর্যায়ে ব্যাপক অনুসন্ধান ও জরিপ চালানোর পর একটি বিষয় উদঘাটিত হয়েছে যে, সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীকে মন্দ পথ থেকে ফেরানোর জন্য কোনোরূপ নসিহত বা সতর্ক করা ব্যতীত কিংবা অন্য কোনো সহজ পন্থা অবলম্বন না করে শাস্তি প্রদান রীতি দিয়ে শুরু করলে কাঙ্খিত ফলাফল পাওয়া যায় না। বরং প্রশিক্ষণ দান কালে যে কোনো ভুল পদ্ধতির প্রয়োগের মাধ্যমে সংশোধনের চেষ্টা করা হলে হিতে বিপরীত হয়।ফলাফল হয় উল্টা। সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণার্থী কোনোভাবেই সেই সব মন্দ অভ্যাস ছাড়তে চায় না। বরং জেদের কারণে আরো বেশি করে করতে লাগে। তাই সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষকদেরকে কার্যকর ও ফলপ্রসূ প্রশিক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে বিশদভাবে জানতে হবে এবং তার কায়দা কানুন, রীতি-নীতি সম্বন্ধে গভীর ব্যূতপত্তি অর্জন করতে হবে। যাতে প্রশিক্ষণ হয় সঠিক, নির্ভুল ও শতভাগ কার্যকর।

ভুল প্রশিক্ষণ ও অন্যায্যভাবে শাস্তি প্রদান প্রশিক্ষণার্থীদেরকে মানসিকভাবে দুর্বল করে দেয় এবং তাদের আত্মিক ক্ষতি সাধন করে। পিতা-মাতার পক্ষ হতে সন্তানদেরকে -হক কিংবা না হকভাবে- সার্বক্ষণিক তিরষ্কার, তাদের সাথে নির্দয় ও কঠোর আচরণ তাদের হীনমন্যতা ও মানসিক রোগের সবচে বড় কারণ। তাদের মেধা ও প্রতিভা বিকাশের প্রধান অন্তরায়। এসব কারণে তাদের মন ও মননে বিরূপ প্রভাব পড়ে। এ ভুল পদ্ধতির দুষ্ট ক্ষত নিয়ে তারা বেড়ে উঠে এবং ক্রমান্বয়ে মানসিক, চারিত্রিক ও আদর্শিক দিক থেকে বেঁকে যেতে থাকে।

জরিপের সাথে সংশ্লিষ্ট বড় বড় প্রশিক্ষণ বিজ্ঞানীরা দাবি করে বলেছেন, বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে আরব বিশ্বে সন্তান প্রশিক্ষণ পদ্ধতি হচ্ছে কর্তৃত্ব ও প্রভাব বিস্তারমূলক পদ্ধতি।

যা গঠিত হয়েছে, জবরদস্তি ও বাধ্য করণ, কর্তৃত্ব স্থাপন করণ, প্রভাব বিস্তার করণ ও ভীতি প্রদর্শন মূলনীতির উপর। এর একমাত্র কারণ, কার্যকর ও ফলপ্রসূ প্রশিক্ষণ প্রণালী বিষয়ক জ্ঞানের অভাব এবং পরিস্থিতির বিচার-বিশ্লেষণ না করেই শাস্তি প্রদান রীতির যথেচ্ছ ব্যবহার।

প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত ইসলামের প্রধান মূলনীতি হচ্ছে: নম্রতা, কোমলতা ও উৎসাহ প্রদান

ইসলাম সব সময় পুরস্কৃত করণ ও উৎসাহ প্রদান নীতিকে ভীতি প্রদর্শন ও শাস্তি প্রদান নীতির উপর অগ্রাধিকার দিয়ে এসেছে। ইসলাম বলে, মৌলিকত্বের বিচারে প্রশিক্ষকদের পক্ষ হতে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রতি দয়া, মহানুভবতা, নম্রতার পন্থা অবলম্বনই হল প্রধান মূলনীতি। ইমাম বুখারি রহ. 'আল-আদাবুল মুফরাদ' গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ উদ্‌ধৃত করেছেন, তিনি বলেন,

عليك بالرفق واللين وإياك والعنف والفحش.

অর্থাৎ, তুমি নম্রতা ও কোমলতার রীতি গ্রহণ কর, আর কঠোরতা ও অশ্লীলতাকে পরিত্যাগ কর।

অনুরূপভাবে ইমাম মুসলিম রহ. তাঁর 'সহিহ'তে সাহাবি আবু মুসা আশআরি রা. থেকে উদ্‌ধৃত করেছেন,

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ومعاذا إلى اليمن و قال لهما: يسرا ولاتعسرا، وعلّما ولاتنفرا.

অর্থাৎ, আবু মুসা আশআরি রা. বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ও মুয়াজ রা.কে ইয়েমেন পাঠিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, 'তোমরা সহজ করবে কঠিন করবে না। শেখাবে (অর্থাৎ উৎসাহ দিবে) তাড়িয়ে দিবে না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন,

إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه. رواه البخاري.

'নিশ্চয় কোমলতা (র অনুবর্তন) বস্তুকে কেবল সুন্দরই করে।' (বর্ণনায় বোখারি)

ইসলাম প্রবর্তিত বে-নজির ও ফলপ্রসূ এই শিক্ষানীতির সার্থক বাস্তবায়ন দেখতে পাই আমরা পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রশিক্ষক মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে। ইমাম মুসলিম রহ. উদ্‌ধৃত করছেন,

أن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أماه! ما شانكم تنظرون إليّ ؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمّتونني سكتّ، فلمّا صلّى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمّي ما رأيت معلّما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولاشتمني، بل قال صلى الله عليه وسلم : إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيئ من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن.

মুয়াবিয়া ইবনুল হাকাম আস-সালামি রা. বলেন, 'একবার আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সালাত আদায় করছিলাম, জনৈক ব্যক্তি হঠাৎ হাঁচি দিল। আমি বললাম, 'য়ারহামুকাল্লাহ'। লোকেরা আমার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। আমি বললাম, ওয়া ছুকলা উম্মাহ

(আরে মহা জ্বালা), কি ব্যাপার আমার দিকে তাকিয়ে আছ? এ কথা শুনে তারা নিজ নিজ হাত দ্বারা স্বীয় উরুতে আঘাত করতে লাগল। আমি বুঝলাম, তারা আমাকে চুপ করাতে চাচ্ছে, তাই নীরব হয়ে গেলাম। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত শেষ করলেন -তাঁর উপর আমার পিতা-মাতা কোরবান হোক, শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে আমি তাঁর পূর্বে ও পরে তাঁর চেয়ে উত্তম প্রশিক্ষক আর কাউকে পাইনি। আল্লাহর কসম, তিনি আমাকে ধমক দেননি, আঘাত করেননি এবং গালমন্দও করেননি।- বরং বলেছেন, নিশ্চয় এই সালাতে মানুষের কোনো কথা সঙ্গত নয় বরং এটি হচ্ছে, তাসবিহ, তাকবির ও কোরআন তেলাওয়াত'।

এই হলো, ইতিহাসের অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিক্ষাবিদ, শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গৃহীত প্রশিক্ষণ পদ্ধতি। ভুল সংশোধনের আদর্শ দৃষ্টান্ত।

কঠোরতার রীতি এড়িয়ে উৎসাহ প্রদান রীতিই অগ্রাধিকারযোগ্য। আর সাহস যুগিয়ে কাজ নেয়ার নীতিই আদর্শ নীতি এবং ফল প্রদানে সর্বাধিক কার্যকর। বিশ্ববিখ্যাত চিন্তক আল্লামা ইবনে খালদুনও এই মতবাদ পোষণ করতেন। তিনি তাঁর বিখ্যাত রচনা 'মোকাদ্দামা'-তে উল্লেখ করেছেন, 'ছাত্র কিংবা ভৃত্য পর্যায়ের প্রশিক্ষনার্থীর সাথে যদি প্রশিক্ষক কঠোরতার নীতি অবলম্বন করে প্রশিক্ষণ দেয় তাহলে এটি তার মেধা ও মননে বিরূপ প্রভাব ফেলে, অন্তর সংকোচিত হয়ে যায়, প্রতিভা বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়, উদ্যম বিদায় নেয় এবং সে অলস ও অকর্মন্য হয়ে পড়ে। ক্রমাগত ধমক ও হুমকির কারণে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে তা থেকে বাঁচার জন্য মিথ্যা, প্রতারণা ও চালাকির পথ অনুসরণ করে।

তবে ইবনে খালদুনও অন্যান্য ইসলামি চিন্তাবিদদের মত বলেছেন, নম্রতা ও কোমলতার পদ্ধতিতে কাজ না হলে কিংবা কাঙ্খিত ফল পাওয়া না গেলে কঠোর নীতি গ্রহণ করাতে দোষ নেই। বরং তখন তাই করতে হবে।

সুতরাং শিশুর মাঝে ভাল কিছু পরিদৃষ্ট হলে প্রশংসা করতে হবে। আর মন্দ আচরণ প্রকাশ পাওয়া মাত্রই শাস্তি দেওয়া উচিত হবে না। বরং প্রথম প্রথম উপেক্ষা করবে, এমন ভাব করবে যেন তিনি দেখেননি। যদি তাতে কাজ না হয় তাহলে উপদেশ দিবে। সতর্ক করবে। মন্দ আচরণের কুপ্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করবে। নানা ভাবে বুঝানোর চেষ্টা করবে। তাতেও কাজ না হলে অপরাধের মাত্রার সাথে সঙ্গতি রেখে হালকা শাস্তি দিবে। জেদের বশবতি হয়ে কিংবা রাগ-রোষের কারণে যেন বাড়াবাড়ি হয়ে না যায় সে দিকে খুবই সতর্ক থাকতে হবে।

শাস্তি কার্যকর করার আগে অপরাধীর স্বভাব ও প্রকৃতি সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করা

মানুষ মাত্রই ভিন্ন ভিন্ন স্বভাবের অধিকারী। প্রকৃতিগত দিক যেমন বোধ-বুদ্ধি, নমনীয়তা, নসিহত গ্রহণ করার প্রবণতা ইত্যাদি বিষয়ে তাদের মাঝে ভিন্নতা বিদ্যমান। তেমনি মেজাজ-মর্জির দিক থেকেও তারা ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির। কেউ একেবারে শান্ত-শিষ্ট-ভদ্র মেজাজের। কেউ কেউ মাঝারি মানের আবার অনেক আছে চরম জেদী ও বদ মেজাজি। এ প্রকৃতি ভিন্নতার বিবিধ কারণের মধ্যে একটি কারণ হচ্ছে বংশানুক্রম ও পরিবেশগত অবস্থা। এখন নানা প্রকৃতির অপরাধীকে যদি একই শাস্তির আওতায় আনা হয় তাহলে ভাল ফলাফলের আশাতো করা যাবেই না বরং অনেক ক্ষেত্রে বিপরীত হবে। তাই প্রকৃতি ও পরিবেশের কথা বিবেচনা করে সংশোধন পদ্ধতিতে ভিন্নতা আনতে

হবে এবং প্রত্যেকের মেজাজ ও পরিবেশের সাথে সঙ্গতি রেখে তার সাথে প্রযোজ্য ও কার্যকর সংশোধন পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে। অনেক শিশু আছে অপরাধ থেকে ফেরানোর জন্য সামান্য সংকেত বা ইশারাই যথেষ্ট। যেমন প্রবাদ আছে, বুদ্ধিমান ইশারাতেই বুঝে নেয়। কিছু শিশু আছে চোখ রাঙিয়ে ধমক না দিলে কাজ হয় না। আবার অনেক আছে, তিরষ্কার ও বকাঝকা করতে হয়। এসবে কাজ না হলে কারো কারো ক্ষেত্রে বেত্রাঘাতের প্রয়োজন হয়। প্রশিক্ষক একান্ত নিরুপায় হয়ে সর্বশেষ প্রতিশেধক হিসাবে এই পদ্ধতির দ্বারস্থ হন। এই তারতম্য প্রকৃতিগত বিভিন্নতার কারণেই হয়ে থাকে।

কবি চমৎকার বলেছেন,

العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة

কৃতদাসকে নাড়া দিতে লাঠির প্রয়োজন হয়, আর স্বাধীনের জন্য ইশারাই যথেষ্ট।

সুতরাং সকল অপরাধীর জন্য একই শাস্তি প্রযোজ্য নয়। বরং মেজাজ মর্জির বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে প্রত্যেকের প্রকৃতি ও অবস্থানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে। আর তাই প্রশিক্ষককে এসব ক্ষেত্রে প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে হবে।

শাস্তি প্রদানে ক্রমান্বয়িক নীতি ও তার গুরুত্ব

অসভ্য আচরণ নিয়ন্ত্রণে অনেকগুলো পদ্ধতি রয়েছে। শাস্তিপ্রদান পদ্ধতি হচ্ছে সর্ব শেষ পদ্ধতি। আর এর চূড়ান্ত স্তর হচ্ছে শারীরিক আঘাত বা প্রহার। তাই প্রশিক্ষককে চূড়ান্ত স্তরে যাওয়ার আগে পর্যায়ক্রমিকভাবে প্রাথমিক স্তরগুলো পাড়ি দিতে হবে। এবং অন্য পদ্ধতিগুলো আগে প্রয়োগ করতে হবে। তাহলেই বোধ করি সন্তানের মাঝে বিদ্যমান বক্রতা ও আচরণগত মন্দ দিকগুলোর সংশোধন হবে। এবং এর মাধ্যমে তার চারিত্রিক ও সামাজিক উন্নতি বিধানের ইপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে। ইমাম গাযালির ভাষায়. প্রশিক্ষক হচ্ছেন চিকিৎসকের মত। তাই প্রথমে তাঁকে লুকিয়ে থাকা রোগ সম্পর্কে জানতে হবে। আক্রান্ত স্থান সম্বন্ধে ধারণা নিতে হবে। রোগের ধরণ প্রকৃতি বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে। যাতে যথোপযুক্ত চিকিৎসা প্রয়োগ করে রুগীকে সুস্থ করা যায়। সহজ পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে চিকিৎসা সম্ভব হলে কঠিন পদ্ধতির দিকে ধাবিত হওয়া উচিত হবে না। হ্যাঁ কোনো পদ্ধতিতে কাজ না হলে চূড়ান্ত পদ্ধতি অবলম্বন করাতে দোষ নেই। যেমন বলা হয়, সেঁক দেওয়া হলো সর্বশেষ চিকিৎসা...।

খানিক আগে আমরা আলোচনা করেছি, কার্যকরিতার দিক দিয়ে একই পদ্ধতি সকল অপরাধীর ক্ষেত্রে এক সমান নয়। বরং অপরাধ, অপরাধীর মেজাজ, পরিবেশ-পরিস্থিতি ইত্যাদির বিভিন্নতায় সংশোধন ও শাস্তি প্রদান পদ্ধতিও বিভিন্ন হয়ে যায়। এ কারণেই এই বিষয়ে একটি কার্যকর নীতিমালা থাকা খুবই প্রয়োজন। যা বহু ধাপ বিশিষ্ট একটি সিঁড়ির মত হবে। আর প্রশিক্ষকদের দায়িত্ব হবে পরিস্থিতি বিচার বিশ্লেষণ করে যতদূর সম্ভব নিম্নধাপ থেকে শুরা করা। সাথে সাথে লক্ষ্য রাখতে হবে সর্ব প্রকার অপরাধ নির্মূলে কিন্তু একই শাস্তি কার্যকর নয়। বা সব অপরাধ একই ধরণের শাস্তি তলব করে না। আরো লক্ষ্য রাখতে হবে অপরাধের ধরণ ও মাত্রার সাথে সামঞ্জস্য রেখেই শাস্তি প্রদান জরুরি। যেমন বলা হয়ে থাকে, শারীরিক শাস্তি বা বেত্রাঘাত হচ্ছে উক্ত সিঁড়ির সর্বশেষ ও চূড়ান্ত ধাপ তাই একান্ত নিরুপায় না হলে ঐ দিকে যাওয়া ঠিক হবে না।

শাস্তি প্রদানে ক্রমান্বয়িক নীতি অবলম্বনের প্রয়োজন মূলত: দুইটি কারণে

এক. প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রে শাস্তি প্রদান করতে হলে একাধিক বিকল্প পদ্ধতি থাকা বাঞ্ছনীয়। কারণ শিশুরা প্রকৃতিগতভাবে বার বার ভুল করে। শাস্তিও -সাধারণত- দিতে হয় একাধিক বার। তাই পদ্ধতিগত দিক থেকে শাস্তির পরিধি অনেক দীর্ঘ হওয়া জরুরি। যাতে মাধ্যমগুলো খুব দ্রুত ফুরিয়ে না যায় এবং কাছাকাছি সময়ের মধ্যে একই পদ্ধতি বার বার প্রয়োগ করতে না হয়। কারণ তাতে শাস্তির ক্রিয়া নি:শেষ হয়ে যায় এবং এক পর্যায়ে অকেজোই হয়ে যায়।

দুই. শাস্তি হিসাবে অন্যসব মাধ্যম বাদ দিয়ে কেবল বেত্রঘাতের বেশি বেশি প্রয়োগের মাধ্যমে প্রশিক্ষনার্থীকে এর উপর অভ্যস্ত করে তোলার পেছনে বিপদ অনেক। এতে প্রশিক্ষনার্থীর অনেক ক্ষতি হয়। কারণ বেত্রাঘাত শারীরিক শাস্তি, আর শরীর হচ্ছে একটি কষ্ট সহিষ্ণু বস্তু, ধীরে ধীরে কষ্টের উপর অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া তার সৃষ্টিগত প্রকৃতি। তাই এ পদ্ধতির অধিক প্রয়োগের কারণে এক সময় এটি আর কোনো কাজ করবে না। তখন ব্যাপারটি হবে এমন যে, আমরা একই সাথে সবগুলো কার্যকর পদ্ধতি শেষ করে ফেলেছি। কারণ যে শিশু তুলনামূলক কঠিন শাস্তি-বেত্রাঘাতে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে তার ক্ষেত্রে অন্য কোনো পদ্ধতি যেমন চোখ রাঙ্গানি, রাগারাগি, হুমকি-ধমকি ইত্যাদি আর কার্যকর হবে না।

উপরোক্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি বিষয় অত্যন্ত পরিষ্কার হয়ে গেল যে, শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি না করার গুরুত্ব অপরিসীম। এবং তার মাধ্যমে কাজ নেওয়ার ক্ষেত্রে খুবই সাবধানতা অবলম্বন করা জরুরি। কারণ শাস্তির মাত্রা যদি সীমা অতিক্রম করে যায় তাহলে প্রশিক্ষনার্থীর মাঝে আর তার কোনো প্রভাব থাকে না।

শাস্তি প্রদান ও দন্ড বিষয়ক ক্রমধাপ

বিগড়ে যাওয়া শিশুদেরকে সঠিক পথে ফিরিয়ে এনে শিষ্টাচার শেখাতে এবং তাদের মাঝে বিদ্যমান বক্রতা দূর করতে ইসলাম প্রশিক্ষকদের সম্মুখে কার্যকর ও সুস্পষ্ট অনেকগুলো পদ্ধতি তুলে ধরেছে। ইসলামি প্রশিক্ষণ বিজ্ঞানীরা সে লক্ষ্যে সাতধাপ বিশিষ্ট নিম্নোক্ত পর্যায়ক্রম বিন্যাস করেছেন।

প্রথম ধাপ: ভুল বা অপরাধ না দেখার ভান করা এবং এড়িয়ে যাওয়া

কারণ হতে পারে পরিদৃষ্ট ভুলটি অনিচ্ছায় এবং আকস্মিক হয়ে গিয়েছে, ভবিষ্যতে আর নাও হতে পারে। তবে যদি একই ভুল বার বার সংঘটিত হতে দেখা যায় তাহলে আমরা দ্বিতীয় ধাপের দিকে পদার্পণ করতে পারব।

দ্বিতীয় ধাপ: নসিহত ও দিক-নির্দেশনার মাধ্যমে ভুল শুধরে দেওয়া

ভুল সংশোধনে ফলপ্রসূ আলোচনাকে -যার মাধ্যমে কাজের মন্দদিকটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে- প্রথম কার্যকর ধাপ বলে পরিগণিত করা হয়। হাদিস অধ্যয়ন করলে আমরা দেখতে পাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক শিশুকে কত সুন্দর ও নান্দনিকতার সাথে, খুবই সংক্ষিপ্ত তবে প্রভাবমণ্ডিত ভাষায় ভুল ধরিয়ে দিয়েছেন এবং এরূপ ভুল যাতে আবারো না হয় তার প্রতি দিক-নির্দেশনা দান করেছেন।

ইমাম বোখারি ও ইমাম মুসলিম রহ. সাহাবি ওমর বিন আবু সালামা হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধীন একজন গোলাম ছিলাম। (খাওয়ার সময়) আমার হাত প্লেটে (সব স্থানে) ছুটোছুটি করত। তখন আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন! হে বালক, বিসমিল্লাহ বল। ডান হাত দিয়ে খাও। এবং তোমার দিক থেকে খাও।

তৃতীয় ধাপ: কোমল ও সদয় আচরণের মাধ্যমে ভুল ধরিয়ে দেওয়া

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার জনৈক বালককে পানীয় পান ক্ষেত্রে নিজের অধিকার ছেড়ে দিয়ে বয়োজ্যেষ্ঠদেরকে অগ্রাধিকার দান বিষয়ে শিষ্টাচার শেখাতে চাইলেন। তখন তিনি তার সাথে সে বিষয়ে কোমল আচরণ করলেন এবং তাদের বয়সের প্রতি ইংগিত করে তার অনুমতি চাইলেন।

ইমাম বোখারি ও ইমাম মুসলিম রহ. নিজ নিজ গ্রন্থে সাহাবি সাহল বিন সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে উদ্‌ধৃত করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট খানিক পানীয় নিয়ে আসা হল। তিনি তাহতে পান করলেন। (সে সময়) তাঁর ডান পাশে ছিলেন একজন বালক আর বাম পাশে বয়স্ক কিছু সাহাবি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বালককে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি কি আমাকে (পানীয় পাত্র) ওঁদের হাতে দেওয়ার অনুমতি দেবে? বালক বললেন, না, আল্লাহর শপথ, আমি আপনার কাছ থেকে প্রাপ্ত আমার অংশে কাউকে অগ্রাধিকার দেব না। সেখানে বালকটি ছিলেন বিশিষ্ট সাহাবি আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পানীয়ের অবশিষ্টাংশের ক্ষেত্রে নিজেকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

চতুর্থ ধাপ: ইশারার মাধ্যমে ভুল ধরিয়ে দেওয়া

ইমাম বোখারি রহ. সাহাবি আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, ফজল বিন আব্বাস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাহনে তাঁর পেছনে বসা ছিলেন। এরই মাঝে খাসআম গোত্রের জনৈকা নারী সেখানে আসলে ফজল তার দিকে আর সে ফজলের দিকে তাকাতাকি করতে লাগল। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজলের চেহারা অন্য দিকে ফিরিয়ে দিতে লাগলেন।

এখানে আমরা দেখতে পেলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেগানা নারী দর্শনের অপরাধটি কোনো কথা না বলে অপরাধীর চেহারা অন্যদিকে ফিরিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে সংশোধন করেছেন। আর এটি ফজলের মাঝে বিরাট প্রভাব ফেলেছে। তিনি সাথে সাথে সে অপরাধ থেকে ফিরে এসেছেন।

পঞ্চম ধাপ: ভৎসনা ও নিন্দার মাধ্যমে ভুল শুধরে দেওয়া

প্রশিক্ষণ বিজ্ঞানীরা ভৎসনাকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। নির্বাক ভৎসনা -যা প্রথম পর্যায়ে প্রয়োগ হবে- সবাক ভৎসনা যা দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রয়োগ হবে। নির্বাক ভৎসনার মধ্যে রয়েছে প্রশিক্ষণার্থীর সাথে মলিন মুখে কথা বলা। চেহারায় বিরক্তির ছাপ ফুটিয়ে তোলা। শিশুর সাথে হাসিমাখা মুখে

কথা বললে যদি তার হৃদয়ে প্রশান্তি ও আনন্দের উদ্রেক হয়। আর এটি তার প্রতি সন্তুষ্টির পরিচয় বহন করে। তাহলে ঐ হাসির অনুপস্থিতি এবং তার পরিবর্তে মলিনতা অবশ্যই তার ভুল ধরিয়ে দেওয়ার কাজ দেবে এবং সেই ভুল পথ থেকে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা রাখবে। সাইয়্যেদা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো কিছু দেখে অপছন্দ করলে আমরা তাঁর চেহারা দেখেই বুঝতে পারতাম।

সবাক ভৎসনার স্তরটি নির্বাক ভৎসনার তুলনায় একটু কঠিন ও শক্ত। বরং এটি এক প্রকারের শাস্তি। তাই এটি কারো কারো ক্ষেত্রে কার্যকর হলে অন্যদের ক্ষেত্রে কার্যকর নাও হতে পারে। তাছাড়া এর জন্য বিশেষ কিছু নীতিমালা ও কায়দা-কানুন রয়েছে। সবচে গুরুত্বপূর্ণ হল, নিন্দা খুব শক্ত ও কঠোর ভাষায় করা যাবে না, গালমন্দ করা যাবে না, অপমান কিংবা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা যাবে না ইত্যাদি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে প্রশিক্ষণদান ক্ষেত্রে শাস্তির এ পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন। বোখারির বর্ণনায় উদ্‌ধৃত হয়েছে, আবু জর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি এক ব্যক্তির সাথে গালাগালিতে জড়িয়ে পড়ি, আমি তার মায়ের নাম তুলে গালি দিয়ে তাকে অপমান করি-লজ্জা দেই। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আবু জর, তুমি তাকে তার মায়ের নাম তুলে গালি দিলে? তোমার মাঝে জাহেলি সংস্কৃতি বিদ্যমান।

সম্মানিত পাঠক বৃন্দ, আমরা দেখলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রিয় সাহাবি আবু জরকে তিরস্কার করেছেন। এবং ভাষার প্রয়োগের ক্ষেত্রে নবীজী পরিমিত বোধের পরিচয় দিয়েছেন। এমন ভাষাই ব্যবহার করেছেন যা স্থানের সাথে ছিল সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল।

ষষ্ঠ ধাপ: কথাবার্তা বর্জন করার মাধ্যমে ভুল শুধরে দেওয়া

সংশোধনের এ রীতিটি কেবলমাত্র একটি অবস্থাতে কার্যকর হবে, আর তা হলো প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীর মাঝে পূর্ব হতে গভীর হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্কের বিদ্যমানতা। স্বামীর পক্ষে স্ত্রীকে উপদেশ ও নসিহতে কাজ না হলে পরবর্তী শাস্তি হচ্ছে তাকে সাময়িকভাবে ত্যাগ করা এবং কথাবার্তা বন্ধ করে দেওয়া। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

অর্থাৎ, আর তোমরা যাদের অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদেরকে সদুপদেশ দাও, বিছানায় তাদেরকে ত্যাগ কর। {সূরা নিসা:৩৪}

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক ভালবাসা ও হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক সম্বন্ধে সকলেরই জানা ।

বিষয়টিকে কা’ব বিন মালেক রা. এর ঘটনাও সমর্থন করে অত্যন্ত জোরালোভাবে। ইমাম বোখারি রহ. বর্ণনা করেন,

সাহাবি কা’ব বিন মালেক রা. যখন তাবুক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে অংশগ্রহণ না করে অনুপস্থিত থেকে গিয়েছিলেন। সে প্রসঙ্গে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সাথে কথাবার্তা নিষিদ্ধ করেছিলেন, পঞ্চাশ রাত্রি পর্যন্ত এ নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকে। এক পর্যায়ে পবিত্র কোরআনে তাদের তাওবা কবুলের বিষয়টি অবতীর্ণ হয়। আমরা দেখতে পেলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ সাহাবিদের ভুল

সংশোধন ও শুধরে দেওয়ার নিমিত্তে তাদেরকে সাময়িক ত্যাগ করেছিলেন। কথাবার্তা বন্ধ রেখেছিলেন। নবীজীর এ কর্মটি তাদের উপর খুব বেশি প্রভাব ফেলেছিল কারণ তাদের অন্তরে তাঁর অবস্থান ছিল সবার উপরে। তাঁর প্রতি ভালবাসা ছিল সবচে বেশি।

সপ্তম ধাপ: প্রহার বা শারীরিক আঘাতের মাধ্যমে ভুল শুধরানো

অত্যন্ত পরিতাপের সাথে বলতে হয়, বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে আরব দেশগুলোতে সন্তান প্রতিপালন ও প্রশিক্ষণদান কালে শাস্তিপ্রদান প্রয়োজন হলে একলাফে সপ্তম স্তরে চলে যাওয়া হয়। দায়িত্বশীল প্রশিক্ষকরা তার আগের স্তরগুলোর প্রতি নজর দিতে চান না। তাদের এ অবস্থাকে মূল্যায়ন করতে হলে বলতেই হয় যে, তাঁরা তাদের সন্তানদের স্বাধীন লোকদের প্রশিক্ষণ নয়, কৃতদাস জাতীয় প্রশিক্ষণে বিশ্বাসী ।

শারীরিক আঘাত বা প্রহার হচ্ছে শাস্তির সর্বশেষ স্তর যা ইসলামও স্বীকার করেছে এবং ক্ষেত্র বিশেষে ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে। ইসলামের এ অনুমোদন সহধর্মিনী ও বয়স্কলোকদের জন্যও প্রযোজ্য। তবে তার জন্য রয়েছে অনেকগুলো শর্ত । তাহলে উদিয়মান কচি শিশুদের ক্ষেত্রে একেবারে অবাধ হয় কি করে? এতদসত্বেও প্রশিক্ষণ ও শিক্ষাদান ক্ষেত্রে প্রহারের প্রভাব নিয়ে বিজ্ঞানীদের মাঝে খুব বিতর্ক হয়েছে, এখনো চলছে। এরই সূত্র ধরে আরব বিশ্বের বহু রাষ্ট্রের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শাস্তি প্রদান মাধ্যম হিসাবে প্রহারকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বিষয়টি এতদূর গড়িয়েছে যে, কতিপয় প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ ও মনোবিজ্ঞানী প্রহারকে চিরতরে নিষিদ্ধ করেছেন। তারা যুক্তি হিসাবে দাঁড় করেছেন, প্রহার একটি আদিম ও নিষ্ফল পদ্ধতি। এর মাধ্যমে শাস্তিপ্রাপ্ত শিশু মনো ও স্নায়বিকরোগে আক্রান্ত হয়। দু:খের সাথে বলতে হয়, এসব বিজ্ঞানীরা এত তাড়াতাড়ি কিভাবে নিজেদের অতীত ভুলে গেলেন অথবা ভুলে যাবার ভান করলেন। তাঁদের শিশু বয়সে প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার সাথে এ পদ্ধতিরই প্রয়োগের মাধ্যমে তাঁদের ভুল সংশোধন করা হয়েছে। তাঁদেরকে শিষ্ট ও ভদ্ররূপে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। পরবর্তীতে সমাজে তাঁদের একটি মর্যাদাকর অবস্থান তৈরি হয়েছে। কই তাঁরাতো মনোরোগ কিংবা স্নায়বিক রোগে আক্রান্ত হননি?

সর্বশেষ বৃটেনের শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রশিক্ষকদের জন্য শ্রেণীকক্ষে প্রহারের অনুমতি দিয়েছে। বিশেষ করে যেসব ছাত্র গোলযোগ ও অশান্তি সৃষ্টি করে কিংবা প্রহার ছাড়া যাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার আর কোনো উপায় না থাকে। ‘প্রহার একটি কার্যকর ও ফলদায়ক শাস্তি ব্যবস্থা’ বৃটেনের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমতি প্রদানের মাধ্যমে বিষয়টি আরো উজ্জ্বলভাবে প্রমাণিত হল। বিজ্ঞানীরা যে যুক্তির আলোকে প্রহার নিষিদ্ধ করেছেন সেটি আসলে কোনো মৌলিক যুক্তি নয়। কারণ, হতে পারে শাস্তি দাতার বাড়াবাড়ি পর্যায়ের প্রহারের কারণে এমনটি হয়ে থাকতে পারে। তাছাড়া প্রহার ব্যতীত অন্যান্য প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও তার তাৎপর্য সম্বন্ধে তাদের জ্ঞানের স্বল্পতাও এ জন্য দায়ী।

শস্তি পদ্ধতি হিসাবে ‘প্রহার’ কোরআন ও সুন্নাহ দ্বারাও অনুমোদিত।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

(وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ) النساء:34

আর তোমরা যাদের অবাধ্যতার আশংকা কর তাদেরকে সদুপদেশ দাও, বিছানায় তাদেরকে ত্যাগ কর এবং তাদেরকে (মৃদু) প্রহার কর। (সূরা নিসা: ৩৪)

সাহাবি আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

(مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر سنين. (مسند أحمد

তোমারা নিজ সন্তাদেরকে সাত বছর বয়সে সালাতের নির্দেশ দাও, আর তার জন্য দশ বছর বয়সে প্রহার কর। (মুসনাদু ইমাম আহমাদ)

শাস্তি হিসাবে প্রহারের ভয়াবহতার কারণে তাকে অনেকগুলো শর্ত ও সতর্কতা দ্বারা আবদ্ধ করা হয়েছে, সেগুলো আমি খানিক পর আলোচনা করব। প্রহারের পর্বটি ধারাবাহিক কিছু স্তর পাড়ি দেবার পর আসবে।

প্রথমে ঘরে লাঠি কিংবা বেত জাতীয় কিছু ঝুলিয়ে প্রহারের ভয় দেখানো হবে। যেমন ইমাম বোখারি রহ. আদাবুল মুফরাদ গ্রন্থে সাহাবি আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন,

.أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بتعليق السوط في البيت

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে লাঠি ঝুলিয়ে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

এরূপ ভীতি প্রদর্শনে কাজ না হলে অর্থাৎ প্রশিক্ষণার্থী দুষ্টামি থেকে বিরত না হলে হালকা প্রহার করা হবে, যেমন কান ধরে টান মারা ইত্যাদি। ইমাম নববী ‘আল-আজকার’ গ্রন্থে উদ্‌ধৃত করেছেন।

أن عبد الله بن يسر المازني رضي الله عنه قال: بعثتني أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطف من عنب، فأكلت منه .!قبل أن أبلغه إياه، فلما جئت أخذ بأذني وقال: يا غدر

আব্দুল্লাহ বিন ইউসর আল-মাজনি রা. বলেন, আমার মা আমাকে আঙ্গুরের একটি থোঁকা দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পাঠালেন। আমি সেটি তাঁর কাছে পৌঁছে দেয়ার আগেই তা হতে কিছু খেয়ে ফেলেছি। এরপর তাঁর নিকট আসলে তিনি আমার কান ধরে বললেন, আরে দুষ্ট!

এতেও কাজ না হলে শারীরিক শাস্তি অর্থাৎ প্রহার করা যাবে। তবে খুব শক্ত মার দিয়ে রক্তাক্ত বা আহত করে ফেলা যাবে না। মাথা, বুক, পেট ও লজ্জাস্থান জাতীয় স্পর্শকাতর জায়গায় আঘাত করা যাবে না। গবেষকরা গবেষণা করে বের করেছেন যে শরীরে প্রহারের জন্য সবচে উপযুক্ত জায়গা হচ্ছে, দু’হাত ও দু’পা।

প্রহারের সর্বশেষ ও চূড়ান্ত স্তর হচ্ছে জনসম্মুখে প্রহার করা। যদি পরিস্থিতি দাবি করে তাহলে তাই করতে হবে। শাস্তির প্রতিটি পদ্ধতির চূড়ান্তরূপ হচ্ছে তা-ই। শাস্তির এ পদ্ধতি অপরাধীর জন্য অপরাধ হতে নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে অধিকতর কার্যকর আর প্রত্যক্ষদর্শীদের জন্য সতর্ককারী।

যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿2﴾ (سورة النور : 2)

ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী তাদের প্রত্যেককে একশ'টি করে বেত্রাঘাত কর। আর যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান এনে থাক তবে আল্লাহর দীনের ব্যাপারে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে পেয়ে না বসে। আর মুমিনদের একটি দল যেন তাদের আযাব প্রত্যক্ষ করে। {সূরা নূর:২}

এখানে লক্ষনীয় বিষয় হচ্ছে, আয়াতের শুরুতে আল্লাহ তাআলা বেত্রাঘাতের কথা বলে শেষাংশে বলেছেন তাদের শাস্তি যেন মুমিনদের একটি দল প্রত্যক্ষ করে। এর উদ্দেশ্য বোধ করি অপরাধীকে অপরাধ হতে কার্যকরভাবে ফিরিয়ে আনা এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের সকর্ত করা।

প্রশিক্ষণ বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত করেছেন যে, ছোট বাচ্চাকে তার সাথীদের সম্মুখে শাস্তি প্রদান করা হলে ফল প্রদানের দিক থেকে বেশি কার্যকর হয়। কারণ এর মাধ্যেমে তার অন্তরে ভীতির সৃষ্টি হয় যে এরূপ চলতে থাকলে তাদের কাছে তার মর্যাদাগত অবস্থান আর ধরে রাখা যাবে না, নীচে পড়ে যাবে। আর এ কারণেই প্রকাশ্য শাস্তি দানের প্রতি কেবল ইশারা করা হলেই অপরাধ থেকে ফিরে চলে আসে। শাস্তি প্রয়োগেরও প্রয়োজন হয় না।

কার্যকর শাস্তি প্রদানের শর্তসমূহ:

শাস্তিপ্রদান কে অপরাধ নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার বা সংশোধন পদ্ধতি হিসাবে প্রয়োগ করার জন্য প্রাথমিকভাবে কিছু শর্তের অনুবর্তিতার প্রয়োজন। গুরুত্বপূর্ণ কিছু শর্ত নিচে উল্লেখ করা হল:

১. তুলনামূলক সহজতর সংশোধন পদ্ধতির বিদ্যমানতায় শাস্তি প্রয়োগের দিকে অগ্রসর না হওয়া। যেমন আলোচনা, উপদেশ, সঠিক পথের প্রতি দিকনির্দেশনা দান ইত্যাদি প্রয়োগ করা ব্যতীত প্রথমেই শাস্তি প্রদান পদ্ধতির দ্বারস্থ না হওয়া। এ গুলোতে কাজ না হলে পরবর্তী পর্যায়ে এ পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে।

২. শাস্তি বাস্তবায়ন কালে অতিরঞ্জন না করা। এতে করে শিক্ষার্থী বিগড়ে যাবে। কোনো শাস্তিই সে আর গ্রহণ করবে না।

৩. বাচনিক শাস্তি প্রয়োগের সময় অশালীন, অশ্রাব্য ভাষা ব্যবহার না করা। গালমন্দ না করা।

৪. বাস্তবায়ন যোগ্য নয় এমন কথা বলে হুমকি না দেওয়া। যেমন, ফের এসব করলে একেবারে হত্যাই করে ফেলব। জবাই করে দেব ইত্যাদি।

৫. শিক্ষা গ্রহণের জন্য বাচ্চাকে বাধ্য করণার্থে শাস্তি প্রয়োগ পদ্ধতি গ্রহণ না করা।

৬. শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে অপরাধ সঙ্ঘটিত হবার সাথে সাথে তড়িৎ ব্যবস্থা নেওয়া। অপরাধ ও শাস্তি প্রদানের মাঝে দীর্ঘ সময় বিলম্ব না করা।

৭. শাস্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে ক্রমান্বয়িক পন্থা অবলম্বন করা। এবং শিক্ষার্থীর বয়স, মেজাজ ও পরিবেশ-পরিস্থিতি বিবেচনা করে পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৮. শাস্তি যেন প্রশিক্ষকের ক্রোধান্বিত অবস্থায় প্রয়োগ না হয়। কারণ শাস্তিদাতা শাস্তি প্রদানের সময় রাগান্বিত থাকলে সেটি আর সংশোধনের পর্যায়ে থাকবে না। প্রতিশোধ গ্রহণের পর্যায়ে চলে যাবে। এবং এর দ্বারা সংশোধন করা হবে না, হবে জিঘাংসা চরিতার্থ করা।

৯. শাস্তি প্রদান যেন পানাহার থেকে বারণ পর্যায় পর্যন্ত না গড়ায়। কারণ এর মাঝে বাচ্চার স্বাস্থ্যগত ক্ষতি নিহিত আছে। এর দ্বারা বাচ্চার সংশোধন হবে না। বরং উপকারের জায়গায় ক্ষতি হয়ে যাবে।

এখানে আরও কিছু শর্ত আছে যা শুধুমাত্র প্রহার বা শারীরিক শাস্তির সাথে সংশ্লিষ্ট। সংক্ষিপ্তাকারে কিছু পেশ করা হল:

১. প্রহার শুরুর বয়স : বাচ্চাকে কত বছর বয়স থেকে প্রহার করা যাবে এ নিয়ে প্রশিক্ষণ বিজ্ঞানীরা ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। কেউ বলেছেন, দশ বছর বয়স থেকে অর্থাৎ বাচ্চার বয়স দশ বছর হলে প্রহার করা যাবে এর আগে নয়। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতের জন্য দশ বছরের পর বেত্রাঘাতের নির্দেশ দিয়েছেন। তবে আরও উত্তম মত হলো, বাচ্চার ভালো-মন্দ পার্থক্য করার মত বয়স হয়ে গেলে এবং ভুল ও অপরাধ বুঝার মত বুদ্ধি হয়ে গেলেই প্রহার করা যাবে। অর্থাৎ যখন থেকে সে বুঝতে শিখবে যে আমি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছি কিংবা এ অপরাধের জন্য আমাকে শাস্তি পাওয়া উচিৎ তখন থেকেই তাকে প্রহার করা যাবে।

২. আঘাতের সংখ্যা নির্ধারণ। প্রহার করার আগে প্রশিক্ষককে অপরাধ ও অপরাধীর অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে আঘাতের সংখ্যা নির্ধারণ করে নিতে হবে। কারণ কোনো কোনো অপরাধীর ক্ষেত্রে কেবল একটি বেত্রাঘাত অপরাধ থেকে ফেরাতে যথেষ্ট। আবার কারো কারো ক্ষেত্রে আরও বেশির প্রয়োজন হতে পারে। তবে উত্তম হচ্ছে, আঘাতের সংখ্যা দশ-এর বেশি না হওয়া। এ দিকটির প্রতি কঠিন ভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। কারণ ইমাম বোখারি রহ. নিজ ‘সহিহ’তে সাহাবি আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন,

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يجلد فوق حد من حدود الله فوق عشر جلدات.

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নির্ধারিত হদের বেশি-দশ বেত্রাঘাতের বেশি কাউকে বেত্রঘাত করতেন না।

তবে বাচ্চা যদি বয়োপ্রাপ্তির সন্ধিক্ষণে উপনীত হয় আর সম্পাদিত আরাধের চাহিদা আরো বেশি হয় তাহলে পরিস্থিতির বিচারে দশ-এর অধিকও আঘাত করা যাবে।

৩. শরীরের একই স্থানে প্রহার না করে বিভিন্ন জায়গায় আঘাত করা। এবং খুব হালকাভাবে প্রহার করা। মনে রাখতে হবে, প্রহার করা হচ্ছে শিষ্টতা শেখানোর জন্য, প্রতিশোধ নেবার জন্য নয়।

৪. মাথা, বক্ষদেশ, পেট ও লজ্জাস্থানের মত স্পর্শকাতর জায়গায় প্রহার করা যাবে না।

৫. প্রহারের সময় প্রহারকারী প্রশিক্ষককে শান্ত ও স্বাভাবিক অবস্থায় থাকতে হবে। রাগান্বিত অবস্থায় প্রহার করা যাবে না। এতে জুলুম হয়ে যেতে পারে এবং শাস্তিপ্রাপ্ত শিশু প্রয়োজনের অতিরিক্ত কষ্ট পেতে পারে।

৬. অপর কোনো শিশু বিশষত: তার সাথীকে প্রহারের কতৃত্ব দিবে না।

৭. পেটানোর জন্য লাঠি বাছাই করা। উত্তম হলো সোজা ও মাঝারি আকারের কাঁচা বেত।

শাস্তি প্রয়োগের পর প্রশিক্ষনার্থীর সাথে প্রশিক্ষকের সম্পর্ক ও ব্যবহার কেমন হবে?

শাস্তি প্রদানের পর প্রশিক্ষক শাস্তিপ্রাপ্ত প্রশিক্ষনার্থীর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে দেখবেন। যদি দেখা যায় যে শাস্তিতে কাজ হয়েছে, অপরাধ থেকে ফিরে এসেছে। অবস্থার উন্নতি সাধিত হয়েছে। স্বভাব ও চালচলনে স্বাভাবিকতা ফিরে এসেছে। তাহলে প্রশিক্ষক তার সাথে স্বাভাবিক হয়ে যাবেন। উদারতা ও স্নেহ সুলভ ব্যবহার করবেন। হাসিমুখে কথা বলবেন। আচরণের মাধ্যমে বুঝাতে চেষ্টা করবেন যে, আমি কেবল তোমার ভালর জন্যই শাস্তি দিয়েছি। তোমার দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের জন্যই কঠোরতা অবলম্বন করেছি। আমার নিজের কোনো স্বার্থ ছিল না এতে। তোমার মঙ্গলই ছিল আমার উদ্দেশ্য। এটিই ছিল দয়াময় ও স্বার্থক প্রশিক্ষক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশিক্ষণ রীতি। এ নীতির অনুবর্তিতায় তিনি নিজ সাহাবিদের প্রশিক্ষণ দান করতেন। শাস্তি প্রদানের পর তিনি তাদের সাথে এরূপ কোমল ব্যবহারই করতেন। দেখুন, তাবুক যুদ্ধে অনুপস্থিত থাকার কারণে শাস্তির সম্মুখীন হওয়া সাহাবি কা’ব বিন মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু’র সাথে তাঁর মাধুর্য্যপূর্ণ ব্যবহারের নমুনা। ইমাম বোখারি রহ. নিজ ‘সহিহ’তে উদ্‌ধৃত করেছেন, কা’ব রা. বলেন,

فلما سلّمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مرّ عليك مذ ولدتك أمّك.

আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম দিলাম। তিনি আমাকে বললেন, -তখন তাঁর চেহারা খুশিতে চমকাচ্ছিল- তোমার মাতা তোমাকে জন্মদানের পর থেকে আজ পর্যন্ত অতিবাহিত হওয়া সবচে উত্তম দিনের সুসংবাদ গ্রহণ কর।

এটি ছিল তাঁর তাওবা কবুল হবার পরের ঘটনা। বাচ্চা শাস্তি প্রয়োগের পর যখন দেখতে পাবে যে শিক্ষক শাস্তিদানের পরও তার সাথে ভাল ব্যবহার করছেন। তাকে আদর-স্নেহ করছেন। তখন সে বুঝে নিবে যে শিক্ষক তার সংশোধন ও ভালর জন্যই শাস্তি দিয়েছেন। তিনি তার কল্যাণই কামনা করেছেন। এতে তার উপর খুব প্রভাব পড়বে। মন্দ অভ্যাস পরিত্যাগে উদ্যোগী হবে। ভুল রাস্তা ছেড়ে ভাল পথে ফিরে আসার উৎসাহ অনুভব করবে। এবং শিক্ষকের প্রতি কোনো বিদ্বেষ বা মন্দ ধারণা জন্মাবে না। মনে এরূপ কিছুই থাকবে না।

ভুল ও কঠিন শাস্তির পরিণতি :

একটি বিষয় সকলেরই জানা থাকা দরকার যে, স্থান-কাল-পাত্র বিচার না করে শারীরিক যন্ত্রণা ও মানসিক শাস্তি প্রদান করা কিংবা শাস্তির সাথে অপরাধের সামঞ্জস্য বিধান না করা শাস্তিপ্রাপ্ত অপরাধীর অন্তরে শাস্তিদাতা প্রশিক্ষকের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষের সৃষ্টি করে। আর অপমান ও লাঞ্ছিত করার উদ্দেশ্যে শাস্তি প্রদানে কঠোরতা করা, কঠিন শাস্তি আরোপ করা, কঠোর আচরণ করা

কিংবা শক্তভাবে হুমকি-ধমকি প্রদান করার দ্বারা কেবল হীনবল, কাপুরুষ ও ছোট মানসিকতা সম্পন্ন প্রজন্মই তৈরি হয়। এসব কারণে তাদের সৃজনশীল মানসিকতা নষ্ট হয়ে যায়। চিন্তা, দর্শন, পরিকল্পনা, সংকল্প ইত্যাদিতে কোনো নতুনত্ব সৃষ্টি করতে পারে না। বরং প্রতিযোগিতায় সবক্ষেত্রে কেবল পিছিয়ে যায়। তাই এসব ক্ষেত্রে সাবধানতা ও বিচক্ষণতার কোনো বিকল্প নেই।

উপসংহার:

উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে পরিস্কার হয়েছে যে প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতাপূর্ণ শাস্তিপ্রদান প্রশিক্ষনার্থীর আচরণিক বৈরিতা পরিবর্তন ও চারিত্রিক উন্নতি সাধনে একটি কার্যকর, ফলপ্রসূ ও সফল প্রশিক্ষণ পদ্ধতি। বিশেষত: যখন সেখানে গুরুত্বপূর্ণ শর্তাবলী ও বিজ্ঞান সম্মত নীতি-পদ্ধতির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়। আরও লক্ষ্য রাখা হয় শাস্তির সম্মুখীন অপরাধী ও অপরাধের প্রকৃতির প্রতি। যেমনিভাবে পরিস্কার হয়েছে শাস্তি প্রদান পদ্ধতির অনুবর্তিতায় শিষ্টতা প্রশিক্ষণ, বদ অভ্যাস ও মন্দ আচরণের মাঝে বেড়ে উঠার ধারা প্রতিরোধ করে। পাশাপাশি প্রশিক্ষনার্থীর মাঝে একটি অনুভূতি ও আত্মমর্যাদাবোধ সঞ্চারিত করে যার মাধ্যমে সে সেসব বৈরি আচরণ ও মন্দ অভ্যাস ত্যাগ করার প্রেরণা লাভ করে। আর শাস্তি বিহীন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সে অপরাধের প্রবণতা নিয়েই বেড়ে উঠে এবং তার মাঝে এক ধরনের পশুত্ব বিরাজিত থাকে। সব সময় নিষিদ্ধ ও মন্দ কাজ কর্মের মাঝে ঘোরাঘুরি করে। বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক আল্লামা মুহাম্মদ কুতুব রহ.-এর দর্শনও আমাদের বক্তব্যকে সমর্থন করছে জরালোভাবে। তিনি বলেন,

“শাস্তি প্রদান রীতির অনুবর্তন ব্যতীত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রজন্ম মূলত: অকর্মন্য ও নির্বোধ প্রজন্ম, জীবনের মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা ও উন্নতির ক্ষেত্রে যারা কোনোই ভূমিকা রাখতে পারে না। দর্শন যতই আকর্ষনীয় ও শ্রুতিমধুর হোক না কেন অনুবর্তনের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতাই অগ্রাধিকার যোগ্য। বাচ্চাদের প্রতি প্রকৃত মায়া-মমতা হচ্ছে সেটিই যা তাদেরকে সোনালী ভবিষ্যৎ গড়তে সহযোগিতা করে। যে মায়া-মমতা তার মূল্যবোধকে বিনষ্ট করে দেয়, ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন করে ফেলে তাকে কোনোভাবেই মমতা বলা যায় না।’’

সন্তানকে অভিশাপ না দেয়া

মাত্র কয়েকদিন আগের ঘটনা। আমাদের পাড়ার রাকিবের মা পানিতে ডুবে মরা কিশোর সন্তানটিকে বুকে জড়িয়ে পাগলপারা হয়ে কাঁদছেন। মায়ের বাঁধভাঙ্গা কান্না আর বিলাপ শুনে উপস্থিত কারো পক্ষেই চোখের পানি সংবরণ করা সম্ভব হচ্ছিল না। তিনি কাঁদছেন আর বিলাপ করে বলছেন, 'ও বাবুর আব্বু তুমি আমাকে মেরে ফেল। আমিই তোমার সন্তানকে হত্যা করেছি। গতকালই ওর জ্বালা সহ্য করতে না পেরে আমি বলেছি, 'তুই মরিস না; মরলে দশটা ফকিরকে খাওয়াতাম।'

হ্যা, সত্যিই তিনি আগেরদিন ছেলেটির দুরন্তপনায় অস্থির হয়ে এমন বলেছিলেন। তখন একজন পাগলেরও ভাবার অবকাশ ছিল না যে গর্ভধারিণী মা সত্যিই তার সন্তানের অমঙ্গল কামনা করছেন। কিন্তু অসচেতনভাবে কামনা করা দুর্ঘটনাও কখনো সত্য হয়ে দেখা দিতে পারে। রাকিবের মা গতকাল রাগের মাথায় যে কথা উচ্চারণ করেছিলেন কে জানত আজই তা বাস্তব হয়ে দেখা দেবে।

ঘটনা হলো, সেদিন দুপুরে ছেলেটি তার মায়ের সঙ্গে শুয়ে ছিল। তিনটার দিকে হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হলে একরকম জিদ করেই সে মায়ের কাছ থেকে ছুটে গিয়েছিল বৃষ্টিতে ভিজতে। বাড়ির বাইরে এসে সে আশপাশের সমবয়সী আরও কয়েকটি কিশোরকে পেয়ে যায়। সবাই মিলে কোন বুদ্ধিতে যেন দল বেঁধে যায় পাশের মহল্লার একটি নতুন পুকুরে গোসল করতে। সেখানে গিয়ে সবার আগে সে-ই লাফ দেই পুকুরে। অবুঝ কিশোর ঠিক বুঝতে পারেনি লাফ দিলে পুকুরের প্রায় গভীরে গিয়ে পৌঁছবে সে। যেখানে সাঁতার না জানা একটি কিশোরের জন্য অপেক্ষা করছে অবধারিত মৃত্যু। ঘটনা যা হবার তাই হল। বাচ্চাগুলোর চোখের সামনেই সে পানিতে ডুবল। ওরা ভাবল সে বুঝি তাদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে। কিছুক্ষণ পর তারা ওকে না পেয়ে ভয়ে আশপাশের লোকদের ডেকে আনল। ততক্ষণে অবশ্য তার ক্ষুদেকায় দেহ থেকে প্রাণপাখি উড়াল দিয়েছে।

মা তার সন্তানকে অবর্ণনীয় কষ্টে গর্ভে ধারণ করেন। অমানুষিক কষ্টে পৃথিবীর আলো-বাতাসে আনেন। তারপর নিজের ভালোবাসা আর ত্যাগের সবটুকু উজাড় করে অসহায় একটি শিশুকে যথাক্রমে সুস্থ, সবল, সজ্ঞান ও স্বাবলম্বী করে তোলেন। সন্তান মানুষ করতে গিয়ে বাবা-মাকে যে কতটুকু কষ্ট সহ্য করতে হয় তা শুধু বাবা-মায়েরাই জানেন। বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোতে এ কষ্ট আরও বেশি। এখানে রোজ দ্রব্যমূল্যের সঙ্গে লড়াই করে মানুষকে টিকে থাকতে হয়।

অভাবের কারণে একজন নবীন মাকেও একহাতে সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব আর অপরহাতে বুকের ধন সন্তানটিকে আগলাতে হয়। অনেক মা আছেন যারা সময়মত বাচ্চার খাবারটিও যোগাতে পারেন না রুচিমত। বিশেষত যেসব বাচ্চা জন্মের পর মায়ের বুকের দুধ পায় না। দরিদ্র পরিবারে এসব শিশুকে যে কত কষ্টে মা জননী বড় করে তোলেন তা একমাত্র আল্লাহই ভালো জানেন। এ সময় মায়েদের অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষার প্রয়োজন হয়।

অথচ প্রগলভ চরিত্রের অনেক মা’কে এ সময় ধৈর্যহারাও হতে দেখা যায়। অনেক মা সন্তানের ওপর বিরক্ত হয়ে তাকে অবলীলায় অভিশাপ দিয়ে দিয়ে বসেন। স্নেহময়ী জননী হয়তো তার জীবনের বিনিময়ে হলেও সন্তানের যে কোনো অনিষ্ট রোধ করতে চাইবেন। কিন্তু তিনিই আবার রাগের মাথায় অবচেতনে আদরের সন্তানটির অনিষ্ট কামনা করে বসেন। গ্রাম-বাংলায় প্রায়ই দেখা যায় সন্তানদের দুরন্তপনা বা দুষ্টুমিতে নাকাল হয়ে অনেক মা সরাসরি বাচ্চার মৃত্যু কামনা করে বসেন। ‘তুই মরিস না’, ‘তুই মরলে ফকিররে একবেলা ভরপেট খাওয়াতাম’, ‘আল্লাহ, আমি আর পারিনে’, ‘এর জ্বালা থেকে আমাকে নিস্তার দাও’- এ জাতীয় বাক্য আমরা অহরহই শুনতে পাই। বিশেষত কৈশোরে এসে গ্রাম-বাংলার শিশুদের দুরন্তপনা কখনো সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়। ফলে কিশোর সন্তানকে উদ্দেশ করেই সাধারণত মায়েরা এমন অসহিষ্ণু বাক্যোচ্চারণ করে থাকেন। তাই এ সময় মাকে অনেক বেশি ত্যাগ ও ধৈর্যের পারাকাষ্ঠা দেখাতে হয়।

ইসলামের সার্বজনীন আদর্শের ধারাবাহিকতায় এ বিষয়টি সম্পর্কেও আমরা দিকনির্দেশনা পাই তারই কাছে। এ ব্যাপারেও ইসলাম আমাদের শিক্ষা দেয়। ইসলাম কখনো কারো বিরুদ্ধে অভিশাপ দেয়া বা বদদু‘আ করাকে সমর্থন করে না। আপন সন্তানকে তো দূরের কথা জীবজন্তু এমনকি জড় পদার্থকে অভিশাপ দেয়াও সমর্থন করে না। জাবির ইবন আবদুল্লাহ রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى غَزْوَةِ بَطْنِ بُوَاطٍ وَهُوَ يَطْلُبُ الْمَجْدِىَّ بْنَ عَمْرٍو الْجُهَنِىَّ وَكَانَ النَّاضِحُ يَعْتَقِبُهُ مِنَّا الْخَمْسَةُ وَالسِّتَّةُ وَالسَّبْعَةُ فَدَارَتْ عُقْبَةُ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى نَاضِحٍ لَهُ فَأَنَاخَهُ فَرَكِبَهُ ثُمَّ بَعَثَهُ فَتَلَدَّنَ عَلَيْهِ بَعْضَ التَّلَدُّنِ فَقَالَ لَهُ شَأْ لَعَنَكَ اللَّهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَنْ هَذَا اللاَّعِنُ بَعِيرَهُ ». قَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ « انْزِلْ عَنْهُ فَلاَ تَصْحَبْنَا بِمَلْعُونٍ لاَ تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَلاَ تَدْعُوا عَلَى أَوْلاَدِكُمْ وَلاَ تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ لاَ تُوَافِقُوا مِنَ اللَّهِ سَاعَةً يُسْأَلُ فِيهَا عَطَاءٌ فَيَسْتَجِيبُ لَكُم ».

বাতনে বুওয়াত যুদ্ধের সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে পথ চলছিলাম। তিনি মাজদী ইবন ‘আমর জুহানীকে খুঁজছিলেন। পানি বহনকারী উটগুলোর পেছনে আমাদের মধ্য থেকে পাঁচজন, ছয়জন ও সাতজন করে পথ চলছিল। উকবা নামক এক আনসারী ব্যক্তি তাঁর উটের পাশ দিয়ে চক্কর দিল এবং তাকে থামাল। তারপর তার পিঠে উঠে আবার তাকে চলতে নির্দেশ দিল। উটটি তখন একেবারে নিশ্চয় হয়ে গেল। তিনি তখন বললেন ধুত্‌তুরি। তোর ওপর আল্লাহর অভিশাপ। এ শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নিজের উটকে অভিশাপদাতা এই ব্যক্তিটা কে? তিনি বললেন, আমি হে আল্লাহর রাসূল। তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, ‘তুমি এর পিঠ থেকে নামো। তুমি আমাদের কোনো অভিশপ্তের সঙ্গী করো না। তোমরা নিজেদের বিরুদ্ধে, তোমাদের সন্তান-সন্ততির এবং তোমাদের সম্পদের বিরুদ্ধে দু‘আ করো না। তোমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন মুহূর্তের জ্ঞানপ্রাপ্ত নও, যখন যা কিছুই চাওয়া হয় তিনি তোমাদের তা দিয়ে দেবেন।’ [মুসলিম : ৭৭০৫]

হাদীসের ব্যাখ্যায় মোল্লা আলী কারী রহ. বলেন, অর্থাৎ তোমরা কোনো মুহূর্তেই নিজের বিরুদ্ধে, নিজের সন্তান বা সম্পদের বিরুদ্ধে বদদু‘আ করো না। কারণ, হতে পারে যে সময় তুমি দু‘আ করছো, তা দিনের মধ্যে ওই সময় যখন যা-ই দু‘আ করা হোক না কেন তা কবুল করা হয়। তোমরা তো এ সময় সম্পর্কে আল্লাহর পক্ষ থেকে জ্ঞান প্রাপ্ত নও। (মুবারকপুরী, মিরআতুল মাফাতীহ : ৭/৭০৩)

হাদীসটি বর্ণনা করে আরেক ব্যাখ্যাকার বলেন,

فالحديث يدل على النهي عن كون الإنسان يدعو على أهله وماله، وذلك عندما يحصل له غضب فيحصل منه الدعاء، وهو مشتمل أيضاً على بيان العلة والحكمة في ذلك، وأنه قد يكون هذا الدعاء يوافق ساعة إجابة فيستجاب للإنسان فيما سأل من الشر أو من الشيء الذي لا ينبغي لأهله وماله.

‘হাদীসটি রাগের মাথায় মানুষের তার পরিবার ও সম্পদের বিরুদ্ধে দু‘আ করার নিষিদ্ধতা প্রমাণ করে। হাদীসটি এর কারণও তুলে ধরে। আর তা হলো, এ দু‘আটি কবুলের বিশেষ মুহূর্তে পড়ে যেতে পারে। ফলে মানুষের সবই কবুল হয়ে যায় চাই তা ভালো হোক বা মন্দ, যা সে তার পরিবার বা সম্পদের ক্ষেত্রে প্রত্যাশা করে না।’ [আবদুল মুহসিন, শারহু সুনান আবী দাউদ : ৮/২৮৮]

নিজের সন্তানের বিরুদ্ধে দু‘আ করার অর্থ তো নিজেই নিজেকে হত্যার তথা ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেওয়া। আর এ সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

[وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِ ﴾ [البقرة: ١٩٥ ﴿

‘আর তোমরা নিজ হাতে নিজদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না।’ {সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ১৯৫}

অতএব প্রতিটি মাকে ভেবে দেখতে হবে, আমার রাগের মাথায় উচ্চারণ করা বাক্য যদি সত্যে পরিণত তাহলে কেমন লাগবে? আমি কি তা সহ্য করতে পারব? এ জন্য রাগের মাথায়ও কখনো সন্তানের অমঙ্গল কামনা করা যাবে না। প্রসঙ্গত বলা দরকার যে শুধু মায়েদেরই নয়, আমাদের সবারই উচিত নিজের, নিজের সন্তান ও সম্পদের বিরুদ্ধে বদদু‘আ করা থেকে সংযত হওয়া। রাগের সময় সংযম ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দেওয়া।

আর মেয়েদের সবিশেষভাবে বলতে চাই, মা, আপনি অনেক সয়েছেন, অনেক সবর করেছেন, আরেকটু সবর করুন। রাগের মাথায় সন্তানকে অভিশাপ দেয়া থেকে সংযত থাকুন। আল্লাহ আপনার সহায় হোন। আমীন।

শিশুদের প্রতি রাসূল “ﷺ” এর ভালোবাসা

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘রাসূলের জীবনে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ।’ আর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছোট শিশুদের সাথে ভালোবাসা ও স্নেহপূর্ণ আচরণত করতেন, তাদের সাথে সহানুভুতিশীল হতেন, তাদের অনুভূতির প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। এ প্রবন্ধে নবী

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন থেকে শিশু-কিশোরদের সাথে তাঁর আচরণের কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়েছে।

ছোট-বড় সবার জন্যেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হচ্ছেন সর্বোত্তম আদর্শ। মানুষের ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে সকল স্থানেই রয়েছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তম আদর্শের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি জগৎবাসীর জন্যে এসেছেন শিক্ষক হিসেবে। তাঁর ভালোবাসা আর সুন্দর আচরণ দিয়ে যুবক, বৃদ্ধ সবাইকে তিনি দিয়েছেন দীনের দাওয়াত, শিখিয়েছেন, প্রয়োজনীয় সব বিষয়। উপনীত হয়েছেন তিনি সকল ক্ষেত্রে মানবতার পূর্ণ শিখরে; এই মহৎগুণের মধ্যে রয়েছে শিশুদের প্রতি তার সুন্দর আচার-ব্যবহার, যাতে রয়েছে সকলের জন্য আদর্শ। এ পর্যায়ে সাধারণত কেউ উপনীত হতে পারে না। প্রতিটি মুসলিমের উচিৎ যতটুকু সম্ভব তার আদর্শের অনুসরণ ও অনুকরণ করা। এর মধ্যে রয়েছে শিশুদের সাথে রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সোহাগ ও কৌতুক করা। সংক্ষিপ্ত আকারে এগুলোর কিছু দৃষ্টান্ত নিম্নে তুলে ধরা হলো:

শিশুদের সাথে তাঁর সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ

জাবের ইবন সামুরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

« صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْأُولَى، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَهْلِهِ وَخَرَجْتُ مَعَهُ، فَاسْتَقْبَلَهُ وِلْدَانٌ، فَجَعَلَ يَمْسَحُ خَدَّيْ أَحَدِهِمْ وَاحِدًا وَاحِدًا، قَالَ: وَأَمَّا أَنَا فَمَسَحَ خَدِّي، قَالَ: فَوَجَدْتُ لِيَدِهِ بَرْدًا أَوْ رِيحًا كَأَنَّمَا أَخْرَجَهَا مِنْ جُؤْنَةِ عَطَّار»

“আমি রাসূলের সাথে ফজরের সালাত পড়লাম, অতঃপর তিনি বাড়ির দিকে বের হলেন, আমিও তার সাথে বের হলাম। পথিমধ্যে তার সাথে কিছু বাচ্চাদের সাক্ষাৎ হলো। তিনি তাদের এক এক করে প্রত্যেকের উভয় গালে হাত বুলাতে লাগলেন। মাহমুদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, তিনি আমার উভয় গালে হাত বুলালেন আমি তার হাতের হিম শীতল সুগন্ধি উপলব্ধি করলাম। যেন তার হাতের সাথে সুগন্ধি ব্যবসায়ীর সামগ্রীর ছোঁয়া লেগেছে।”

উসামার প্রতি তাঁর ভালোবাসা:

উসামা ইবন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন,

« كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُنِي فَيُقْعِدُنِي عَلَى فَخِذِهِ، وَيُقْعِدُ الحَسَنَ عَلَى فَخِذِهِ الأُخْرَى، ثُمَّ يَضُمُّهُمَا، ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ ارْحَمْهُمَا فَإِنِّي أَرْحَمُهُمَا»

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ধরে তার এক রানে বসাতেন আর হাসানকে বসাতেন অন্য রানে। অতঃপর তাদের একত্র করতেন এবং বলতেন, ‘হে আল্লাহ! তুমি তাদের উভয়ের প্রতি দয়া করো, কেননা আমি তাদের প্রতি দয়া করি।”[2] অন্য বর্ণনায় এসেছে,

«اللَّهُمَّ أَحِبَّهُمَا، فَإِنِّي أُحِبُّهُمَا»

“হে আল্লাহ! আমি তাদের ভালোবাসি, সুতরাং আপনিও তাদের ভালোবাসুন।”

মাহমুদ ইবন রবী-এর সাথে তাঁর কৌতুক:

মাহমুদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন,

«عَقَلْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَجَّةً مَجَّهَا فِي وَجْهِي وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ سِنِينَ مِنْ دَلْوٍ»

“আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এক বারের পানি ছিটানোর কথা; ‘তিনি আমার চেহারায় বালতি থেকে পানি ছিটিয়েছেন তখন আমার বয়স ছিল পাঁচ বছর যা আমার এখনো মনে আছে।”[4]

তিনি এটা করেছেন কৌতুকরত বা বরকতস্বরূপ, যেমনটি তিনি সাহাবীদের সন্তানদের সাথে করতেন।

শাইখ ইবন বায রহ. বলেন, ‘এটা কৌতুক ও উত্তম চরিত্রের অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।’

হাসান ও হুসাইন-এর সাথে তাঁর আদরপূর্ণ ব্যবহারের নমুনা

১। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বর্ণিত, তিনি বলেন,

« قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَعِنْدَهُ الأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ جَالِسًا، فَقَالَ الأَقْرَعُ: إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنَ الوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: «مَنْ لاَ يَرْحَمُ لاَ يُرْحَمُ»»

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান ইবন আলীকে চুম্বন করেন তখন তার নিকট আকরাহ ইবন হাবেস তামীমী বসা ছিলো। আকরাহ বলল, ‘আমার দশটি সন্তান রয়েছে তাদের কাউকে আমি চুম্বন করি না।’ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিকে তাকালেন এবং বললেন, ‘যে দয়া করে না, তাকে দয়া করা হয় না।”

২। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

« قَدِمَ نَاسٌ مِنَ الْأَعْرَابِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: أَتُقَبِّلُونَ صِبْيَانَكُمْ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، فَقَالُوا: لَكِنَّا وَاللهِ مَا نُقَبِّلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَأَمْلِكُ إِنْ كَانَ اللهُ نَزَعَ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ»»

“কিছু গ্রাম্য লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসল এবং বলল, তোমরা তোমাদের বাচ্চাদের চুমো খাও আমরা তাদের চুমো খাই না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘তোমার অন্তরে দয়া উদ্রেক করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, যদি আল্লাহ তা ছিনিয়ে নিয়ে থাকেন।”

৩। হাসান ও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা রাসূলের সবচেয়ে বেশি প্রিয় ছিলেন। এ ব্যাপারে ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাদের সম্পর্কে বলতে শুনেছি,

«هُمَا رَيْحَانَتَايَ مِنَ الدُّنْيَا»

“তারা আমার পৃথিবীর সুগন্ধিময় দুটি ফুল।”

অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলা আমাকে তাদের দান করেছেন এবং তাদের দিয়ে সম্মানিত করেছেন। সন্তানদেরকে চুম্বন করা হয় এবং সুঘ্রাণ নেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে তাদেরকে সুগন্ধময় ফুলের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

৪। আবূ বাকরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

« رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى المِنْبَرِ وَالحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ إِلَى جَنْبِهِ، وَهُوَ يُقْبِلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً، وَعَلَيْهِ أُخْرَى وَيَقُولُ: «إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ المُسْلِمِين»

“আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিম্বারে আরোহণ অবস্থায় তার খুতবা শুনেছি, আর হাসান তার পাশে ছিল। তিনি একবার মানুষের দিকে তাকাচ্ছেন আরেকবার তার দিকে তাকাচ্ছেন এবং বলেছেন, ‘নিশ্চয় আমার এ সন্তান হলো নেতা। সম্ভবত আল্লাহ তা‘আলা তাকে দিয়ে মুসলিমদের বিশাল দু’দলের মাঝে মীমাংসা করে দিবেন।”

পরবর্তীতে আল্লাহ তা‘আলা তাকে দিয়ে মু‘আবিয়া রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু ও তার সাথীদের এবং আলী ইবন আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর অনুসারীদের ও তার সাথীদের মাঝে মীমাংসা করেন। অতএব, তিনি খেলাফত মু‘আবিয়া রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর জন্য ছেড়ে দেন। ফলে আল্লাহ তা‘আলা তার দ্বারা মুসলিমদের রক্ত হিফাযত করেন।

৫। বারা ইবন আযেব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَى عَاتِقِهِ، يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبَّه»

“আমি হাসান ইবন আলীকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাঁধে দেখেছি এবং বলতে দেখেছি, ‘হে আল্লাহ আমি তাকে ভালোবাসি। অতএব, আপনিও তাকে ভালোবাসবেন।”

সাজদাহ অবস্থায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিঠে বাচ্চার আরোহণ:

শাদ্দাদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

« خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعِشَاءِ وَهُوَ حَامِلٌ حَسَنًا أَوْ حُسَيْنًا، فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَهُ، ثُمَّ كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ فَصَلَّى فَسَجَدَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ صَلَاتِهِ سَجْدَةً أَطَالَهَا، قَالَ أَبِي: فَرَفَعْتُ رَأْسِي وَإِذَا الصَّبِيُّ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ سَاجِدٌ فَرَجَعْتُ إِلَى سُجُودِي، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ سَجَدْتَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ صَلَاتِكَ سَجْدَةً أَطَلْتَهَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ أَوْ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْكَ، قَالَ: «كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ وَلَكِنَّ ابْنِي ارْتَحَلَنِي فَكَرِهْتُ أَنْ أُعَجِّلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَه»

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘর থেকে বের হলেন মাগরিব বা এশার সালাত পড়ানোর জন্য। হাসান বা হুসাইনকে তিনি বহন করছিলেন। অতঃপর তিনি সামনে গেলেন এবং তাকে রাখলেন। এরপর তিনি সালাতের মধ্যে একটি দীর্ঘ সাজদাহ করলেন। আমার পিতা বলেন যে, ‘আমি আমার মাথা উত্তোলন করলাম আর দেখতে পেলাম সাজদারত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাঁধে একটি শিশু। আমি আমার সাজদায় ফিরে আসলাম। যখন রাসূলুলাহ সলালাহু আলাইহি ওয়াসালাম সালাত সম্পন্ন করলেন, তখন লোকেরা বলল, ‘হে আল্লাহর রাসূল! নিশ্চয় আপনি সালাতের মধ্যে একটা দীর্ঘ সাজদাহ করেছেন, যে কারণে আমরা মনে করলাম হয়তো কোনো কিছু হয়েছে অথবা আপনার কাছে ওহী আসছে।’ তিনি বললেন,

‘এগুলোর কোনোটাই হয় নি। তবে আমার একটি সন্তান আমার পিঠে আরোহণ করেছিলো, তাই আমি তার প্রয়োজন পূরণ না করে তাড়াহুড়ো করতে অপছন্দ করলাম।”

সালাতরত অবস্থায় যয়নব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহার মেয়েকে কোলে তুলে নেওয়া:

আবু কাতাদাহ থেকে বর্ণিত যে,

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلِأَبِي العَاصِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا»

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত পড়া অবস্থায় উমামা বিনতে যয়নবকে বহন করছিলেন, যখন তিনি সাজদাহ করতেন তখন তাকে রেখে দিতেন। আর যখন দাঁড়াতেন তখন তাকে কোলে তুলে নিতেন।”

শিশু বাচ্চারা কাঁদার সময় তাঁর সালাত পড়া সংক্ষিপ্ত করা:

তিনি কোনো শিশু বাচ্চার কাঁদার আওয়াজ শুনলে সালাত সংক্ষিপ্ত করতেন। এ ব্যাপারে আবূ কাতাদাহ তার পিতা থেকে ও তার পিতা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

«إِنِّي لَأَقُومُ فِي الصَّلاَةِ أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلاَتِي كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ»

“যখন আমি সালাতে দাঁড়াই তখন ইচ্ছা থাকে সালাত দীর্ঘ করব। কিন্তু যখন কোনো শিশুর কান্নার আওয়াজ শুনি, তখন তার মায়ের কষ্ট হবে ভেবে আমি নামায সংক্ষেপ করি।”[12]

উম্মে খালেদের সাথে হাবশী ভাষায় কৌতক:

এ ব্যাপারে উম্মে খালেদ বিনতে খালেদ ইবন সাঈদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَبِي وَعَلَيَّ قَمِيصٌ أَصْفَرُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَنَهْ سَنَهْ» قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَهِيَ بِالحَبَشِيَّةِ حَسَنَةٌ، قَالَتْ: فَذَهَبْتُ أَلْعَبُ بِخَاتَمِ النُّبُوَّةِ، فَزَبَرَنِي أَبِي، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَعْهَا»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَبْلِي وَأَخْلِفِي ثُمَّ، أَبْلِي وَأَخْلِفِي، ثُمَّ أَبْلِي وَأَخْلِفِي» قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَبَقِيَتْ حَتَّى ذَكَر»

“আমি আমার বাবার সাথে রাসূলের নিকট আসলাম, তখন আমার গায়ে হলুদ বর্ণের জামা ছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘‘ছানাহ! ছানাহ!’’ এটি হাবশী ভাষার শব্দ যার অর্থ, চমৎকার! চমৎকার! তিনি বলেন, ‘অতঃপর আমি নবুওয়াতের মোহর নিয়ে খেলা করতে গেলাম। আমাকে আমার পিতা ধমক দিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘তাকে ধমক দিও না।’ অতঃপর বলেন, ক্ষয় কর এবং জীর্ণ কর, অতঃপর ক্ষয় কর এবং জীর্ণ কর, অতঃপর আবার ক্ষয় কর এবং জীর্ণ কর।’ আব্দুল্লাহ বলেন, অতঃপর সে মহিলা অনেকদিন জীবিত ছিল এমনকি তার কথা বর্ণনা করা হতো (যে অমুক দীর্ঘজীবি হয়েছে)। অর্থাৎ বর্ণনাকারী তার দীর্ঘ জীবনের কথা বুঝিয়েছেন। অনেকে বলেছেন, উম্মে খালেদের মত আর কেহ এত দীর্ঘ জীবন লাভ করে নি।

আবূ উমায়ের সাথে তার কৌতুক:

আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

« كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا، وَكَانَ لِي أَخٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو عُمَيْرٍ - قَالَ: أَحْسِبُهُ - فَطِيمًا، وَكَانَ إِذَا جَاءَ قَالَ: «يَا أَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ» نُغَرٌ كَانَ يَلْعَبُ بِهِ فمات».

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে প্রিয় ছিল আমার এক ভাই, তার নাম আবূ উমায়ের। আমার মনে আছে, সে যখন এমন শিশু যে মায়ের বুকের দুধ ছেড়েছে মাত্র। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছে আসতেন এবং বলতেন, ‘হে আবূ উমায়ের! কী করেছে তোমার নুগায়ের?’ নুগায়ের হলো এমন একটি ছোট পাখি যার সাথে আবু উমায়ের খেলা করত। নুগায়ের মারা গিয়েছিল।”

শিশু বাচ্চাদের সালাম দেওয়া

আনাস ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত যে, তিনি শিশু বাচ্চাদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাদের সালাম দিতেন এবং বলতেন, ‘নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনটি করতেন।”

রাসূলের কোলে শিশুদের প্রস্রাব:

উম্মে কায়স বিনতে মিহসান থেকে বর্ণিত, তিনি তার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে নিয়ে রাসূলের দরবারে আসলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তার কোলে রাখলেন, সে তার কোলে প্রস্রাব করে দিল। তারপর তিনি পানি নিয়ে আসতে বললেন এবং পানি ছিঁটিয়ে দিলেন এবং তা ধৌত করেন নি।

এ ছাড়াও আরো অনেক ক্ষেত্র রয়েছে যা দ্বারা শিশুদের সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তম আচরণ, সুন্দর ব্যবহারের বিষয়গুলোর বর্ণনা রয়েছে। আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোসহ বিভিন্ন স্থানে শিক্ষার্থী ও শিশুদের ওপর শারীরিক যে নির্যাতন করা হয় তা থেকে সরে এসে রাসূলের শেখান পদ্ধতিই অনুসরণ করা উচিৎ।

বড়দের ওপর শিশুদের অগ্রাধিকার দেওয়া:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ডান পাশের শিশু ছেলেকে বড়দের আগে শরবত দিয়েছেন। এ ব্যাপারে সাহল ইবন সায়াদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

« أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَحٍ، فَشَرِبَ مِنْهُ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلاَمٌ أَصْغَرُ القَوْمِ، وَالأَشْيَاخُ عَنْ يَسَارِهِ، فَقَالَ: «يَا غُلاَمُ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَهُ الأَشْيَاخَ»، قَالَ: مَا كُنْتُ لِأُوثِرَ بِفَضْلِي مِنْكَ أَحَدًا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاه»

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এক পেয়ালা শরবত আনা হলো। তার থেকে তিনি শরবত পান করলেন এবং তার ডান পাশে ছিল দলের সবচেয়ে ছোট একটি ছেলে, আর বড়রা ছিল তার বাম পার্শ্বে। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘হে ছেলে তুমি কি আমাকে অনুমতি দিবে যে, আমি তা বড়দের আগে দিব?’ ছেলেটি বলল, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আপনার

অনুগ্রহ লাভের ব্যাপারে আমি অন্য কাউকে আমার ওপর প্রাধান্য দিব না।' অতএব, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দিলেন।"

অন্য বর্ণনায় এসেছে,

فَقَالَ لِلْغُلَامِ: «أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلَاءِ؟» فَقَالَ الْغُلَامُ: لَا وَاللهِ، لَا أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا، قَالَ: فَتَلَّهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَدِهِ

তিনি ছেলেটিকে বললেন, "তুমি কি আমাকে অনুমতি দিবে এদের দেওয়ার। ছেলেটি বলল, না। আল্লাহর কসম! হে আল্লাহর রাসূল! আপনার কাছ থেকে কিছু লাভ করার ব্যাপারে অন্য কাউকে প্রাধান্য দিব না। বর্ণনাকারী বলেন অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাতে রাখলেন।"

একজন সফল গার্ডিয়ানের গুণাবলি

পরিবারের নেতৃত্ব দেন একজন পুরুষ। আল কুরআন পুরুষের ঘাড়েই গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্বের দায়িত্বভার অর্পণ করেছে। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে পুরুষের নেতৃত্ব আদিকাল থেকে চলে-আসা একটি কালচার, যা প্রাকৃতিক কারণেই ঘটে থাকে। পুরুষের মনোগঠন, সপ্রতিভ আচরণ, দৃঢ়চিত্ততা, সাহসিকতা, প্রতিকূল পরিবেশে - আবেগ নয়- বরং বুদ্ধিচালিত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতা, অধিকন্তু শীত-বর্ষা-হেমন্ত-বসন্ত রোদ-বৃষ্টি, আলো-অন্ধকার সকল পরিস্থিতিতে দেহ সঞ্চালিত করে রুটি-রুজির ব্যবস্থা করার শারীরিক ক্ষমতা পুরুষকে সমাসীন করেছে নেতৃত্বের আসনে। তাই পুরুষকেই পালন করতে হবে একটি পরিবারের মূল গার্ডিয়ানের ভূমিকা।

বর্তমান বিশ্বে হাতে-গোণা কয়েকটি দেশ ব্যতীত, সকল দেশেই নারীসমাজ ভোগ করছে, অধিকার ও দায়িত্বের ক্ষেত্রে, পুরুষের মতোই সমান সুযোগ-সুবিধা। তবু সাধারণ ব্যাকরণ ও তিক্ত-সত্য হল, সকল সমাজেই, এখনো, পুরুষরা পালন করে যাচ্ছে নেতৃত্ব প্রদানের মূল ভূমিকা। প্রত্যন্ত গ্রামের মাতব্বর-প্রধানদের থেকে শুরু করে প্রশাসনের বিস্তীর্ণ ময়দানে নেতৃত্বের ভূমিকায় অবতীর্ণদের অধিকাংশই পুরুষ। পৃথিবীর যেকোনো দেশে মন্ত্রীপরিষদ অথবা পার্লামেন্ট মেম্বারদের অধিকাংশই পুরুষ। পুরুষের জেনেটিক অবগঠন নেতৃত্বানুকুল। সে হিসেবে বর্তমান নারীবাদীদের কেউ কেউ মাতৃগর্ভে থাকাকালীন নারী-এব্রয়ও-তে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করে পুরুষের সাথে সমতা আনার দাবি উত্থাপন করেছেন, সেটা যদি করাও হয় তাহলেও তা হবে ঐশী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধাচরণ, প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে বিপরীতে অবস্থান যা কখনো মানবতার জন্য কল্যাণকর হবে না, হওয়ার প্রশ্নই আসে না। এর বড় প্রমাণ মানুষ প্রকৃতিগত বিধানের বিরুদ্ধে যেখানে যা করেছে তার সবগুলোই মানবতা, প্রকৃতি ও পরিবেশের জন্য অকল্যাণকর বলে প্রমাণিত হয়েছে।

এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা অন্য কোনো সুযোগে করা যাবে। এখানে যা বলতে চাচ্ছি তা হল, একটি পরিবারের মূল গার্ডিয়ানশিপ পুরুষের হাতেই ন্যস্ত থাকবে। আর সে ক্ষেত্রে পুরুষকে অর্জন করতে হবে বেশ কিছু যোগ্যতা, যা সুচারুরূপে তার দায়িত্ব পালনে সহায়তা দেবে।

নবী-রাসূলগণ ছিলেন ইনসানে কামেল, মানবিক গুণাবলির পূর্ণাঙ্গতম প্রতিফলন যাদের জীবনে ঘটেছে। নবী-রাসূলগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে সরাসরি দিকনির্দেশনাপ্রাপ্ত, তাই তারা ছিলেন নির্ভুল, আদর্শিক উচ্চতার শীর্ষচূড়ায় অধিষ্ঠিত। সাধারণ মানুষের পক্ষে নবী-রাসূলগণের মতো ইনসানে কামেল হওয়া দু:সাধ্য হলেও আমল-আখলাক-চরিত্র-আদর্শ ইত্যাদির ক্ষেত্রে নবীদের উসওয়া বা আদর্শ সামনে রেখে নিজের জীবনকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে নেয়া সম্ভব। অন্যথায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমাদের জন্য উসওয়া বা আদর্শ হিসেবে পেশ করা হত না। ইরশাদ হয়েছে: {অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও পরকাল প্রত্যাশা করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে}[সূরা আল আহযাব:২১]

সে হিসেবে একজন মানুষ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল আদর্শ আপন করে নিয়ে তার প্রয়োগ ঘটাতে চেষ্টা-সাধনা করে যাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ সামনে রেখে নিজেকে সবসময় বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবে কোন দিকটায় ত্রুটি রয়েছে, কোন দিনটা আরো উন্নত, সুস্মিত করতে হবে। জীবনপর্যায়ের কতটুকু অংশে উসওয়ায়ে রাসূল স্থান করে নিতে পেরেছে। উসওয়ায়ে রাসূলের চাঁচে ফেলে নিজেকে উন্নত করার, পরিমার্জিত করার এক নিরবচ্ছিন্ন মেহনতে-শ্রমে নিজেকে নিক্ষেপ করতে হবে।

উসওয়ায়ে রাসূলের যথার্থ অনুসরণ একজন মানুষকে যোগ্য গার্ডিয়ান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে, পরিবারের দেখভাল, সন্তান লালনের দায়িত্ব যথার্থরূপে পালনের জন্য চারিত্রিক ও আদর্শিক যোগ্যতা দান করবে।

এটা হল একটা জেনারেল কথা যা কেবল গার্ডিয়ানশিপ নয় বরং জীবনের সকল ক্ষেত্রেই প্রাসঙ্গিক বলে মনি করি। আর আমরা যেহেতু গার্ডিয়ানশিপ নিয়ে আলোচনায় বসেছি তাই এ ক্ষেত্রে নবীর উসওয়া-আদর্শ কী তা জ্বলজ্বলে করে বলা আবশ্যক বলে মনে করি।

এ ক্ষেত্রে বলা যায় যে একজন সফল গার্ডিয়ানকে নিম্নবর্ণিত গুণসমূহ অর্জন করে সফল গার্ডিয়ানশিপ নিশ্চিত করতে হবে।

এক. আদর্শের অনুবর্তিতা

একজন গার্ডিয়ান তার পরিবার ও ছেলেমেয়ের তালিম-তরবিয়ত ও আখলাক চরিত্রের প্রহরী। আর যিনি প্রহরী তিনি নিজেই যদি আদর্শচ্যুত হন তবে অন্যদেরকে শেখাবেন কী। আপনি যদি নিজে সিগারেট পান করায় অভ্যস্ত হয়ে থাকেন, আর পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরকে উপদেশ দেন, তোমরা সিগারেট পান করো না; কেননা তা ক্ষতিকর, তাহলে আপনার উপদেশ ধূম্রের মতো বাতাসে উড়ে যাবে। যাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন তাদের মাঝে কোনো ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে না। সে হিসেবে একজন গার্ডিয়ানের জন্য আদর্শের অনুবর্তিতা একটি অপরিহার্য গুণ, যার অনুপস্থিতি গার্ডিয়ানশিপের গোটা প্রক্রিয়াকে ভণ্ডুল করে দেবে, দেওয়া স্বাভাবিক।

দুই. সহিষ্ণুতা ও ধীরস্থিরতা

গার্ডিয়ানকে বিবেচক হতে হবে। আবেগের মাথায় হুট্ করে একটা কিছু করে ফেললেই হবে না। সে হিসেবে তাকে যথেষ্ট পরিমাণ সহিষ্ণু হতে হবে। ভেবে-চিন্তে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। সহিষ্ণুতা ও ধীরস্থিরতা আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় গুণ, হাদিসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক সাহাবিকে বলেছেন :'তোমার মধ্যে এ দুটি গুণ রয়েছে যা আল্লাহর কাছে পছন্দনীয়, সহিষ্ণুতা, ও ধীরস্থিরতা। [মুসলিম:হাদিস নং ১৭]

সহিষ্ণুতা ও ধীরস্থিরতা দাবি হল, আপনি যখন আপনার ছেলেমেয়েকে কোনো অন্যায় করতে দেখবেন, তখন রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে সাথে সাথে মারধর করতে যাবেন না, এ ক্ষেত্রে আপনাকে বরং নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ অনুসরণ করতে হবে। শুরুতে আপনি তাকে জিজ্ঞাসা করবেন কেন এমনটি করল, তারপর তাকে এ ব্যাপারে যা সঠিক তা বাতলে দেবেন। সে যে অন্যায় করেছে তা ব্যাখ্যা দিয়ে বোঝাবেন। সাথে সাথে তাকে একটু আদরও করে দেবেন। হতে পারে সে সংশোধিত হয়ে যাবে। রাফে ইবনে আমর আল-গিফারি হতে বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, তিনি বলেন: বাল্যকালে আমি আনসারদের খেজুর গাছে ঢিল ছুড়তাম, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে বলা হল, ' একটি বালক আমাদের খেজুর গাছে ঢিল ছুড়ছে'। এরপর আমাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে যাওয়া হল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন: হে বালক খেজুর গাছে তোমার ঢিল ছোড়ার কারণ কী? আমি বললাম: (খেজুর) খাই। তিনি বললেন : খেজুর গাছে ঢিল মেরো না। গাছের নিচে যা এমনিতেই পড়ে তা খাও। অতঃপর তিনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ! আপনি এর উদর পরিতৃপ্ত করুন। [ইমাম তিরমিযি হাদিসটি বিশুদ্ধ বলেছেন]

সহিষ্ণুতা ও ধীরস্থিরতার আরেকটি দাবি হল বাচ্ছাদেরকে প্রহার না করা। আমরা অনেকেই মনে করি যে মারধর না করলে ছেলেসন্তান মানুষ করা যাবে না। এ কথা ভুল। বরং হেকমত ও দূরদর্শিতার মাধ্যমে বাচ্চাদের ভুলত্রুটি শুদ্ধ করা জরুরি। আবু উমামা (রাযি:) হতে বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, তিনি বলেন: নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুটি বালক নিয়ে এলেন, তাদের একজনকে আলী (রাযি:) কে দিয়ে দিলেন এবং বললেন, একে মেরো না, কেননা নামাজ আদায়কারীকে মারার ব্যাপারে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। [আলবানি: সহিহু আদাবিল মুফরাদ]

ইসলামে শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্য ইসলাহ ও সংশোধন, প্রতিশোধ ও মনের ঝাল মেটানো নয়। এ কারণে শিশুকে শাস্তি দেয়ার পূর্বে তার মেজাজ-প্রকৃতি বুঝতে হবে। ভুল সম্পর্কে শিশুকে বারবার বলে বুঝাতে হবে। ইবনে খালদুন রা. বলেন, ' যে ব্যক্তি শিক্ষার্থী ও খাদেমদেরকে মারধর ও মাত্রাতিরিক্ত বল প্রয়োগ করে শিক্ষা দিতে যাবে, এমতাবস্থায় এ বলপ্রয়োগই অধিপতি হয়ে বসবে, বলপ্রয়োগকৃত ব্যক্তির হৃদয়ে সংকীর্ণতা আগমন করবে। উদ্যম-উৎসাহ বিদায় নেবে। অলসতা জায়গা করে নেবে। এ কাজ তাকে মিথ্যা ও খারাবির দিকে ধাবিত করবে; সে এরূপ করবে এই ভয়ে যে অন্যথায় দমনপীড়নের খড়্গ তার উপর নেমে আসবে। দমনপীড়ন তাকে ধোঁকা ও ছলচাতুরি শেখাবে। পরবর্তীতে এরূপ করা তার অভ্যাসে পরিণত হবে। মানবতা, যা তাকে শেখানোর উদ্দেশ্য ছিল তা বিকারগ্রস্থ হয়ে পড়বে।

অভিজ্ঞতার সাক্ষী এই যে মারধর কোনো ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনে না। অধিকাংশ সময় মারধর বরং বিপরীত ফলাফল বয়ে আনে। মারধর শিশুর ইচ্ছা শক্তিকে দুর্বল করে দেয়, চেতনার শাণিতভাব বিলুপ্ত করে দেয়, উদ্যম উৎসাহে ব্যত্যয় ঘটায়। সন্তান যদি তার পাশে এমন ব্যক্তিকে পায় যে সবসময় তাকে হেকমত ও সুন্দর ভাষায় তার দায়দায়িত্ব সম্পর্কে বোঝাবে, কাজ করার প্রতি উৎসাহী করে তুলবে। তা হলে কঠিন শাস্তির কোনো প্রয়োজন হবে মনে হয় না।

হ্যাঁ, মারধর করার একান্তর প্রয়োজন হলে তা হতে হবে হালকাভাবে, অর্থাৎ তা হতে হবে এমনভাবে যে মারের আঘাত গায়ের চামড়া ভেদ করে কখনো যেন মাংস পর্যন্ত গিয়ে না পৌঁছায়। শিশুর বয়স দশ বছরের কম হলে হালকাভাবে একসাথে তিন প্রহারের অধিক করা যাবে না। উমর ইবনে আব্দুল আযীয রা. বিভিন্ন এলাকায় এই বলে চিঠি লিখে পাঠাতেন যে , শিক্ষক যেন একসাথে তিন প্রহারের অধিক না দেয়; কেননা এতটুকু শিশুকে ভয় দেখানোর জন্য যথেষ্ট। শিশু দশ বছর বয়সে উপনীত হলে তাকে নামাজ পড়তে বাধ্য করার প্রয়োজনে মারধরের অনুমতি রয়েছে, তবে এক্ষেত্রেও শুধু গাত্রের চামড়ার উপর দিয়ে হালকাভাবে বেশির বেশি দশ প্রহার পর্যন্ত যাওয়া যাবে, এর অধিক নয়। হাদিসে এসেছে: হদ(শরিয়ত নির্ধারিত শাস্তি) ব্যতীত অন্য কোনো ক্ষেত্র দশপ্রহারের অধিক প্রয়োগ করা হবে না। [বুখারি:৬৩৪২]

হালকাভাবে কেবল গাত্রের চামড়া স্পর্শ করে এমনভাবে প্রহার করতে হবে এই জন্য বললাম যে কুরআনের ব্যাখ্যাকারগণ ব্যভিচারকারীর উপর শাস্তি প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা যে শব্দটি প্রয়োগ করেছেন তা হল {فاجلدوا } মুফাসসিরগণ বলেছেন যে এর অর্থ এমনভাবে প্রহার করা যা চামড়া অতিক্রম করে না। যদি চামড়া অতিক্রম করে মাংস পর্যন্ত চলে যায় তাহলে সেটা হবে ইসলামের আদর্শবহির্ভূত অযাচিত একটি কর্ম।

যেসব ক্ষেত্রে প্রাপ্তবয়স্কদের উপর হদ প্রয়োগের কথা আছে সেখানেও প্রহার করার মাধ্যম - বেত ইত্যাদি- কর্কশ বা গিটযুক্ত হওয়া নিষেধ। যায়েদ ইবনে আসলাম থেকে এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এক ব্যক্তি ব্যভিচার করেছে বলে স্বীকার করে নেয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাস্তি প্রয়োগের জন্য একটি বেত আনতে বললেন, অতঃপর একটি ভাঙ্গা বেত আনা হল। তিনি বললেন, এর চেয়ে ভাল। অতঃপর একটি নতুন বেত নিয়ে আসা হল যার গিটগুলো তখনো অকর্তিত। তিনি বললেন, এর চেয়ে নিচে। এরপর একটি বেত নিয়ে আসা হল যার গিটগুলো কর্তিত এবং বেতটিও নরম। অতঃপর তিনি নির্দেশ দিলেন এবং তাকে জিদল (প্রহার) করা হল। [মুয়াত্তায়ে ইমাম মালেক, কিতাবুল হুদুদ:২১৯৯]

প্রহারকারীর ক্ষেত্রে উমর (রাযি:) এর নির্দেশ হল হাত এমনভাবে না উঠানো যাতে বগলের নীচ প্রকাশ পেয়ে যায়।[ইবনে আব্দুল বারর, আত্তামহিদ: খণ্ড :৫, পৃষ্ঠা ৩৩৪] অর্থাৎ প্রহার যেন শক্ত ও কঠিনভাবে না হয়।

প্রহারকালীন কোনো শিশু যদি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করে তবে সাথে সাথে প্রহার বন্ধ করে দেয়া জরুরি। হাদিসে এসেছে যে ব্যক্তি তোমাদের কাছে আল্লাহর নামে আশ্রয় প্রার্থনা করল, তাকে আশ্রয় দাও। এবং আল্লাহর নামে যে চাইল তাকে দাও। [সহিহুল জামে:৬০২১]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো শিশুকে কোনো দিন মারধর করেন নি। বেশির বেশি তিনি হালকাভাবে কান ডলা দিয়ে দিতেন। এমনকী জেহাদের ময়দান ব্যতীত তিনি তার নিজ হাতে কাউকে প্রহার করেন নি। হাদিসে এসেছে, আয়েশা (রাযি:) বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাত দিয়ে কাউকে কখনো প্রহার করেন নি। না কোনো নারীকে, না খাদেমকে, হ্যাঁ, যদি তিনি আল্লাহর রাস্তায় জেহাদে থাকতেন, (তবে ভিন্ন কথা)।[মুসলিম : ৪২৬৯]

অতএব এ ক্ষেত্রে খোলাসা কথা হল, শিশুকে আদব শেখানো প্রহারের আশ্রয় ব্যতীতই সম্পন্ন হওয়া উচিত। হিকমত-প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা, পরিণতি-চিন্তা ইত্যাদি বিবেচনায় রেখে শিশুকে আদব শেখানোর উত্তম পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত। দশ বছরের নিচে যার বয়স এমন শিশুকে প্রহার করার ক্ষেত্রে হালকাভাবে একত্রে তিন প্রহারের ঊর্ধ্বে যাওয়া যাবে না। দশ বছরের ঊর্ধ্বে হলে হালকাভাবে দশ প্রহার পর্যন্ত যাওয়া যাবে, এর বেশি নয়।

তিন. দয়া ও কোমলতা প্রদর্শন এবং হিংস্রতা থেকে দূরে থাকা

আয়েশা (রাযি:) থেকে এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘নিশ্চয় আল্লাহ দয়ালু, তিনি কোমলতাকে পছন্দ করেন। তিনি কোমলতার বিপরীতে দেন যা তিনি সহিংসতার বিপরীতে দেন না, কোমলতা ব্যতীত অন্য কিছুর বিপরীতে দেন না। [মুসলিম]

আয়েশা (রাযি:) থেকে আরেকটি হাদিসে এসেছে, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘নিশ্চয় আল্লাহ কোমলতাপূর্ণ, তিনি সকল বিষয়ে কোমলতাকে পছন্দ করেন’। [বুখারি ও মুসলিম]

জারির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযি:) থেকে এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, যাকে কোমলতা থেকে বঞ্চিত করা হল তাকে সকল কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত করা হল’। [মুসলিম]

ইমাম আহমদ আয়েশা (রাযি:) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার তাকে খেতাব করে বলেছেন, হে আয়েশা! তুমি কোমলতা অবলম্বন করো; কেননা আল্লাহ তাআলা যখন কোনো পরিবারের কল্যাণ চান তখন তাদেরকে কোমলতার পথ দেখান, - অন্য এক বর্ণনা মতে- আল্লাহ যখন কোনো পরিবারের কল্যাণ চান, তিনি তাদের মধ্যে কোমলতার প্রবেশ ঘটান’। [আহমদ]

শিশুদের প্রতি কোমলতা প্রদর্শনের একটি অতি উজ্জ্বল উদাহরণ হল, নামাজরত অবস্থায় হাসান ও হুসাইন (রাযি:) এর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র পিঠে আরোহণ করার ঘটনা। আবু হুরায়রা (রাযি:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এশার নামাজ আদয়রত ছিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজ পড়ছিলেন। তিনি যখন সেজদায় যেতেন হাসান ও হুসাইন (রাযি:) তাঁর পিঠে লাফ দিয়ে উঠত। তিনি যখন সেজদা থেকে মাথা উঠাতেন তাদেরকে ধরে হালকাভাবে রাখতেন। তিনি যখন আবার সেজদায় যেতেই তারা পুনরায় ফিরে আসত। অতঃপর তিনি যখন নামাজ শেষ করলেন একজনকে এখানে ও অন্যজনকে ওখানে রাখলেন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এলাম এবং বললাম, য়্যা রাসূলাল্লাহ! আমি কে এদেরকে তাদের মায়ের কাছে

নিয়ে যাবো? তিনি বললেন, না। অতঃপর আকাশে বিদ্যুৎ চমকাল। তিনি তাদেরকে বললেন, ‘ তোমরা তোমাদের মায়ের কাছে যাও’। তারা সে বিদ্যুতের আলোতে চলতে চলতে বাড়িতে গিয়ে প্রবেশ করল। [হাকেম:৩/১৬৭]

চার: মমত্বপূর্ণ হৃদয়

একজন গার্ডিয়ানকে হতে হবে মমত্বপূর্ণ হৃদয়ের অধিকারি। নির্দয়, কঠিন হৃদয় ব্যক্তির পক্ষে যথার্থরূপে গার্ডিয়ানশিপের দায়িত্ব পালন সম্ভব হবে না। আবু সুলায়মান মালেক ইবনে হুয়াইরেস বলেন: আমরা কতিপয় সমবয়সী যুবক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বিশ দিন অবস্থান করলাম। আমাদের প্রতি তিনি ছিলেন কোমল ও দয়াময়। তিনি মনে করলেন যে আমরা আমাদের পরিবার পরিজনের সাথে সাক্ষাতের জন্যে আকাঙক্ষী হয়ে পড়েছি। তিনি আমাদেরকে আমাদের পরিবার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, আমরা তাকে এ ব্যাপারে জানালাম। অতঃপর তিনি আমাদেরকে বললেন, ‘ তোমরা তোমাদের পরিবারের কাছে ফিরে যাও, এত সময় এত দিন থাক। যখন নামাজের সময় হবে, তোমাদের একজনে আজান দেবে, ও তোমাদের মধ্যে বয়সে যে বড় সে ইমামতি করবে। [বুখারি ও মুসলিম]

ইবনে উমর (রাযি:) থেকে এক বর্ণনায় এসেছে, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘ প্রতিটি বৃক্ষেরই ফল রয়েছে, আর কলিজার ফল হল সন্তান। আল্লাহ তাআলা ওই ব্যক্তিকে রহম করেন না যে ব্যক্তি তার সন্তানের প্রতি করুণা প্রদর্শন করে না। যার হাতে আমার আত্মা তার কসম, দয়ার্দ্র ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আমরা বললাম, য়্যা রাসূলাল্লাহ! আমরা সবাই তো দয়াশীল। তিনি বললেন, ‘তোমাদের কারো দয়ার্দ্র হওয়ার অর্থ এ নয় যে সে তার সাথীর প্রতি দয়ার্দ্র হবে। বরং দয়া-করুণা হল মানুষের প্রতি দয়া করা। [বুখারি ও মুসলিম]

পাঁচ: দুটি বিষয়ের মধ্যে যা অধিক সহজ তা বেছে নেওয়া যদি তা পাপপূর্ণ না হয়।

সফল গার্ডিয়ানের গুণাবলির মধ্যে একটি হল, দুটি বিষয়ের মধ্যে সহজতর বিষয়টি বেছে নেওয়ার যোগ্যতা, যদি তাতে গুনাহ না থাকে। আয়েশা (রাযি:) হতে এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখনই দুটি বিষয়ের মধ্যে একটি বেছে নেয়ার সুযোগ দেয়া হত, তখনই তিনি সহজটি বেছে নিতেন তা যদি পাপপূর্ণ না হত। আর তিনি কখনোই নিজের জন্য কোনো বিষয়ে প্রতিশোধ নিতেন না। তবে হ্যাঁ, আল্লাহর হুরমত লঙ্ঘিত হলে তিনি আল্লাহর জন্য প্রতিশোধ নিতেন। [বুখারি ও মুসলিম]

ছয়: রাগ-রোষ বর্জন করা

একজন সফল গার্ডিয়ানের অন্যতম একটি গুণ হল রাগ-রোষ থেকে দূরে থেকে ঠাণ্ডা মাথায় কার্যবিধি নির্ধারণ করা; কেননা রাগ, উন্মত্ততা, একঘেয়েমি আদব শেখানোর ক্ষেত্রে একটি নেতিবাচক গুণ। সামাজিকভাবেও তা অনাকাঙ্খিত একটি অভ্যাস। মানুষ যদি তার রাগ-রোষ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, হজম করতে পারে তবে তা নিজের জন্য ও সন্তানদের জন্য বয়ে আনবে কল্যাণ। এর উল্টো হলে ফলাফলও হবে বিপরীত। জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের কাছে নিজের জন্য বিশেষ উপদেশ চাইলে তিনি তাকে রাগ না করার উপদেশ দেন। [দ্রঃ: সিলসিলাতুল আহাদিস আস সাহিহা:৯৩৮]

শুধু তাই নয়, বরং রাগ সংবরণকে তিনি আসল বীরত্ব বলে আখ্যায়িত করেন। আবু হুরায়রা (রাযি:) হতে এক বর্ণনায় এসেছে, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘ বীর-বাহাদুর সে নয় যে কুস্তিতে অন্যকে পরাহত করতে পারে। বরং বীর-বাহাদুর সে যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে’। [বুখারি ও মুসলিম]

সাত : মধ্যমপন্থা অবলম্বন

কট্টরপন্থা সকল ক্ষেত্রে নিন্দনীয় একটি গুণ। এ-কারণেই আমরা দেখতে পাই যে ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ নামাজের ক্ষেত্রেও তিনি মধ্যমপন্থা অবলম্বনকে পছন্দ করেছেন। আবু মাসুদ উকবা ইবনে উমর আল-বাদরি বর্ণনা করে বলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল যে আমি অমুকের কারণে ফজরের নামাজে আসি না। সে আমাদেরকে নিয়ে দীর্ঘ করে নামাজ পড়ে। কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বক্তৃতা দানকালে এত বেশি রাগ করলেন ইতঃপূর্বে যা অন্য কোনো বক্তৃতায় করেন নি। অতঃপর তিনি বললেন: ‘হে লোকসকল! নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে এমনও রয়েছে যারা বিতাড়ক, তাই তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ইমামতি করবে সে যেন সংক্ষেপ করে; কেননা তার পেছনে বৃদ্ধ, শিশু ও প্রয়োজনগ্রস্থ লোক রয়েছে’। [বুখারি ও মুসলিম]

মধ্যমপন্থী বিষয় উত্তম বিষয় বলে একটি কথা আছে। কাজেই একজন গার্ডিয়ানকে তার পোষ্যের লালন-পালনের ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন অবশ্যই জরুরি।উপরে বর্ণিত গুণগুলো পূর্ণাঙ্গরূপে কারও মধ্যে পাওয়া গেলেই কেবল গার্ডিয়ানশিপের ক্ষেত্রে সফলতা অর্জনের আশা করা যেতে পারে। আল্লাহ আমাদের সহায় হউন।

সমাপ্ত

তথ্যসূত্র

islamhouse.com

alkawsar.com

ahlehaqmedia.com

sistersforuminislam

quraneralo.com

সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৩২৯।

সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬০০৩।

সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৭৩৫।

সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৭।

সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৯৯৭।

সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৯৯৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৩১৭।

সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৯৯৪।

সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৭৪৬।

সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৭৪৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৪২২।

নাসাঈ, হাদীস নং ১১৪১।

সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫১৬।

সহীহ বুখারী, হাদীস ৭০৭।

সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩০৭১।

সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬২০৩।

সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬২৪৭।

সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২২৩।

সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৩৫১।

সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২০৩০।